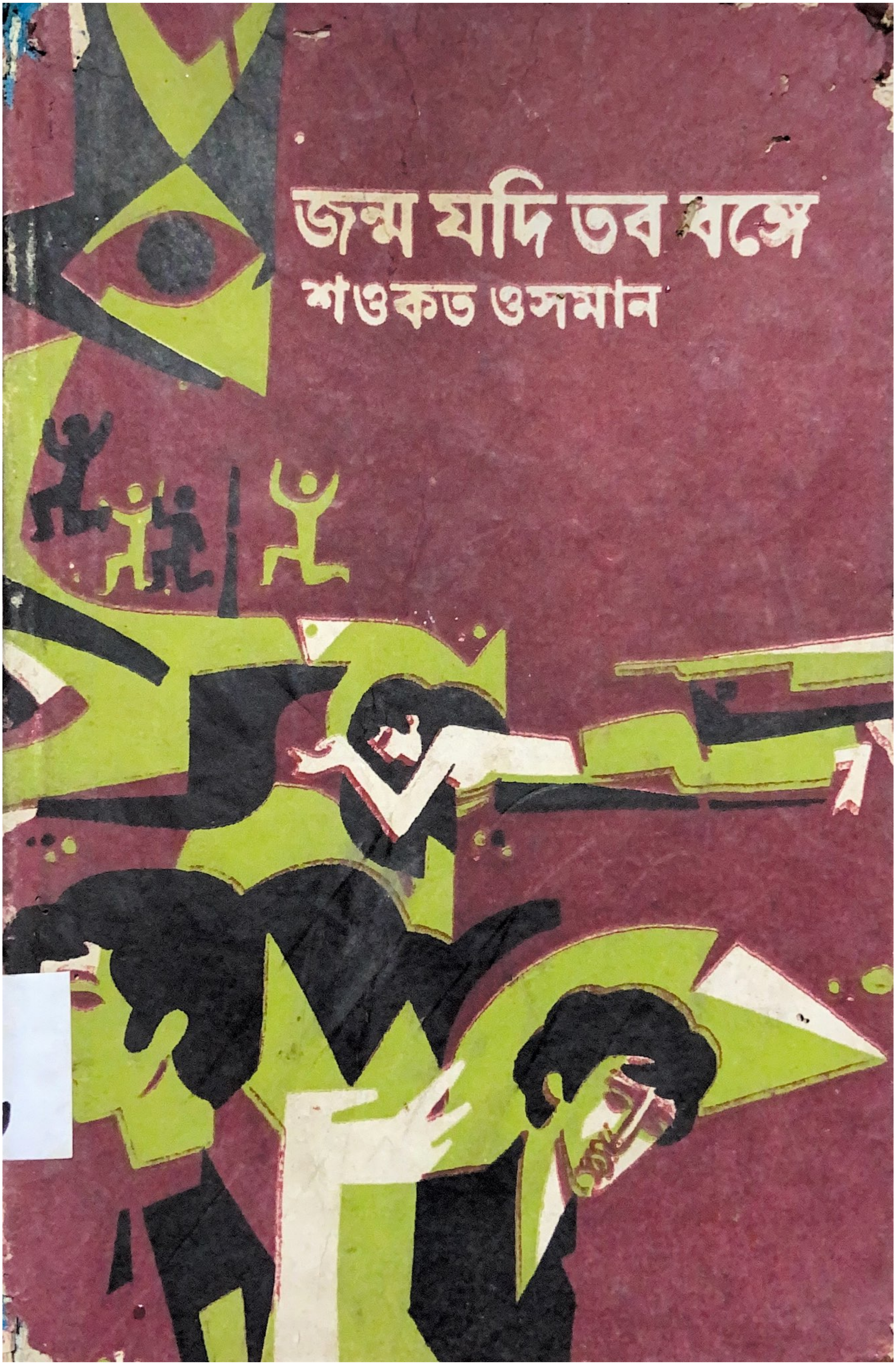
জন্ম যদি তব বঙ্গে
শওকত ওসমান

জন্ম যদি তব বঙ্গে

শওকত ওসমান

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
আবুল বারক আলভী
ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
মূল্য ছয় টাকা

JANMA JADI TABA BANGE
By Shaukat Osman
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj
Dacca—1
Bangladesh.
Price Taka 6·00

উৎসর্গ

সঞ্জয় প্রয়োজন—

সঞ্জীব দত্ত

বন্ধুবরেষু—

713
SH7

ভূমিকা

এই বইয়ের সব গল্প স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ১৯৭১—৭২ সনে লিখিত ও প্রকাশিত। মনের তাগিদে রচনা। কিন্তু বাকী কাজ অর্থাৎ প্রকাশনার ব্যাপারে আমার আঠরো মাসে বছর। ১৯৭০ সনের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি এখনও তা দিচ্ছে। এই বইও বেরুতে-বেরুতে দশ মাস কেটে গেল। রচনার গুণাগুণের বিচার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। এই সব গল্পের চরিত্র কাল্পনিক। রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

শ. ও.

সূচীপত্র

আলোক অন্বেষা ১
বারুদের গন্ধ লেবাননের ধোঁয়া ১২
সারেঙ সুখানী ১৯
বার্তাবহ ২৮
জন্ম যদি তব বঙ্গে ৩২
রক্তচিহ্ন ৩৮
দুই ব্রিগেডিয়ার ৪৬
ক্ষমাবতী ৫৩
ভারতীয় গোয়েন্দা ৬২
জননী ঃ জন্মভূমি ৭৩
ওয়াগন ব্রেকার ৮১

আলোক অন্বেষা

চোখের উপর একটু আলতো হাত বুলাতে পারলেও যেন এখন কিছুটা যন্ত্রণার উপশম হতো।

অসহ্য অস্থিরতা ভেতরে ভেতরে এত ঘুরপাক রত যে, সালামৎ আলী ঠিক হদিস করতে পারছিল না। এই মুহূর্তে যথা-প্রতিষেধ তার জন্যে কী আছে। হঠাৎ-ই মনে পড়ল অমন করস্পর্শের কথা, যদিও সচেতন ভাবে কিছু নয়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে হাত তুলতে গিয়ে সালামৎ নিদারুণভাবে অনুভব করলে, তার যো নেই।

হাতকড়ার শাসন ধমকে সব ঠাণ্ডা করে দিল।

কিন্তু সালামৎ সহজে পেছপা হয় না। মাথা নিয়ে গেল সে নিজের হাতের চেটোর মধ্যে। সেখানে দুই ফেটি-বাঁধা চোখ ঘষতে লাগল।

হঠাৎ তার এমন নত মুখ পাঞ্জাবী প্রহরীর চোখ এড়ায় নি। সে ব্যাপারটা দেখেই চুপ করে যেতে পারত। কিন্তু তা দূরের কথা, বরং উল্টো গালাগাল ছুঁড়লে, 'এই শালা, বাঙ্গালীকা বাচচা!'

কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না সালামৎ আলী। কিন্তু কান তো খোলা। তার বুঝতে দেরী হয় না, শান্ত্রীর চোখ তার দিকে ঠিকই আছে। কিন্তু মাথা খসে পড়ছে যে-মাথা করতালুর মধ্যে বন্দী, তবু কিছু সোয়াস্তি পাচ্ছিল।

সালামৎ আলি তখন হঠাৎ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, তার চোখ এমনি ফেটি-বাঁধা।

পৃথিবী কেমন দেখতে? নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে বসে। তারপর জবাব নিজেই দিতে এগোয়। বহু অতীত তখন হুড়াহুড়ি ধাক্কা দিতে

থাকে তার মনের ভাসমান সমতলে জায়গার জন্যে। এই গুঁতোগুতি অনেকক্ষণ চলে।

ওদিকে চোখের যন্ত্রণাও চেপে বসছে। তবু হাতড়ে-ফেরা দৃষ্টি যেটির মধ্যেই ছবি আঁকতে থাকে। অজস্র বুদ্‌বুদ্‌, অজস্র রঙের স্রোত কেবল অক্ষিপটের ভেতর দিয়ে হুহু ঢুকে যাচ্ছে গন্তব্যহীন যাত্রায়।

কিন্তু সে তো এক ঠিকানায় এসে পৌঁছেছে।

কোন্‌ জায়গায় তাকে মিলিটারিরা এখন আস্তানা দিয়েছে? তার একটা হদিস করা যেত। তবু কিছু শান্তি! ঢাকা শহরে তার জন্ম সেই একান্ন সনে। কুড়ি বছরে এই ছোট শহর জরীপে কিছু বাদ নেই তার। একটা জায়গার নাম পেলে সে যেন সব যন্ত্রণা ভুলে যেত। শান্তিনগর, মালিবাগ, শাঁখারিপট্টি, ইসলামপুর, রমনার কোন এলাকা? এ জায়গা ধানমণ্ডির নয়াবাদ অভিজাত-পল্লীর কাছাকাছি কোথাও হোতে পারে না। বন্দীশিবির আর কোথাও নিশ্চয়। শহরের মাঝখানে এত লোক ধরে রাখবে, অন্যান্য মানুষকে ভয় দেখাতে এমনও হোতে পারে। কিন্তু হাতড়ে কিছু ছেঁটে যেতে পারলে সে বুঝতে পারত, তার আস্তানার হদিস কি? মেঝে পাকা। আর কিছু বোঝার উপায় নাই। কারণ, ঠায় বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকা। কড়া হুকুম। এদিক ওদিক করলে সাই-কেলের চেন পেটা, করবে। দু'বার শাস্তির রোলার তার দেহের উপর দিয়ে ঘষড়ে ঘষড়ে কিছু কাপড়, কিছু রক্ত, কিছু ছাল নিয়ে গেছে।

আর তাগদ বেশী নেই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা একটা দানা পড়েনি পেটে। তার জন্যে কোন আফসোস নেই। একবার দেখতে পেত সে পৃথিবী কেমন, তা হোলেই ক্ষুৎপিপাসা সব মিটে যেত।

বাইরের জগৎ শব্দ দিয়ে চেনা যায়। এখানে বড় সীমাবদ্ধ। জীপের যাতায়াত, স্টার্ট ধ্বনি আর ভারী বুটের আওয়াজ, কালেভদ্রে কথাবার্তা। এখানে যা মনুষ্যকণ্ঠ উচ্চারিত হয়, তা শুধু হুকুম। আর কিছু না।

নিকটে আশেপাশে লোক থাকলে, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা না হোক নিঃশ্বাসের বাতাস অন্তত কিছু জানান দিয়ে যেত। সেদিক পর্যন্ত শূন্য। শান্ত্রীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ হোতে পারত আহারের ব্যবস্থা থাকলে' তাও নেই।

অবিশ্যি ক্ষুধা যা প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সালামৎ আলি একবার অনুভব করেছিল। তারপর তার দেহ-যন্ত্রের আর কোন চাহিদা নেই। কেবল চোখ বেয়াড়া জিদ্দী ছেলের মত বায়না নিয়ে মেতে আছে: আলো, এতটুকু আলো দাও। অতি ঝাপসা। হিমপ্রত্যূষের কুয়াশালেপা ক্ষীণতম আলো যা চোখ তেড়ে ধরতে হয়, এমন আলো।

এই প্রার্থনার জবাবে কিন্তু অন্ধকার কেবল ধেয়ে আসে, ঘনীভূত হয়—শেষে পুরু কালো পর্দার মত সামনে ঝুলে থাকে আর নড়ে না। এমন ঘনত্বের ধাক্কায় সালামৎ আলি মূর্ছা যেতে যেতে আবার সামলে নিত, অত সহজে নয়। একদিকের ঘাড় কাৎ করে কিছু বিশ্রাম। তার পরে আবার অন্য ঘাড়ে আশ্রয়। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার হেরফের।

তার জীবনে এখন শুধু বর্তমান আছে। মনে হয়, অতীত মুছে গেছে। অতীতের তাই ধর্ম। কিন্তু তার মরা দেহ, বকুল ফুলের মত শুকিয়ে গেলেও সহজে সৌরভ হারায় না। বর্তমানে অতীত আর পূর্বের কলেবরে নেই। স্মৃতি যখন কসায়ের চাপট এবং যার উপর আঘাত হানে কুঁচি কুঁচি করে ছাড়ে আস্ত হাড় তখন চোখ বুঁজে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেহাই পেতে চাইলেও অসুবিধার মাত্রা শুধু বাড়ে। তার চেয়ে খামখা চীৎকার দাও না কেন? ডুকরে কান্না বা গোঙানি যন্ত্রণা লাঘব করে এই ক্ষেত্রে। কিন্তু কান্না পুরুষ মানুষের অলঙ্কার নয়। সালামৎ আলি তাই সাইকেলের চেন-পেটা হওয়ার সময় নিঃশব্দে কাৎরেছে। পেশী, মুখের বা যন্ত্রণাসিত অন্য অঙ্গের, সঙ্কুচিত করেছে বার বার, কিন্তু শব্দের ভুবনে ধরা দেয়নি।

এখন সঙ্গীরা অনুপস্থিত, কিন্তু ধরা পড়ার সময় তার কাছে ছিল। তিন চার জন। এমনি পথে তাদের সঙ্গে আলাপ। আর বিপদ তো পথেই তাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সবাই একে একে সরে গেছে। তা আর চোখে দেখা হয় নি, কারণ ফেটি বাঁধা। অনুভব করতে হয়েছে সালামৎকে। অপরাধ এখানে সাধারণ সংজ্ঞায় চালু নয় —মার খেয়েছিল। বেদম মার। তখন গোঙাতে শুরু করেছিল। বিদ্রূপ করে উঠেছিল পাঞ্জাবী-প্রহরী "এই শালা বাঙালী কা বাচ্চা আওরৎ কা তরেহ রোতা হ্যায়......না, মরদ, বুজদীল (ভীরু)...।" সেইজন্য সালামৎ চুপ করে আছে? না। সে জানে, শত্রু যেখানে জন্তুর অধম, সেখানে

মানুষের মত ব্যবহার অনুচিত, অসঙ্গত। জন্তুকে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে হয়। আর অন্য কোন রাস্তা সেখানে বন্ধ, তার তো সে যো নেই। তার হাত বাধা। কাছাকাছি প্রহরী আসে না। এলে একটা লাথি অন্তত দিত। তারপর যা হয় হোক! একবার সালামৎ আলির মনে হয়েছিল খুব কাছে পাঞ্জাবী নেকড়েটা, তার কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু কিছু তো দেখতে পাচ্ছে না সে। লাথি যদি ফস্কে যায়, খামখা হেনস্থা ডেকে এনে লাভ কি? সেইজন্যেই তো আলোর জন্যে যত প্রার্থনা। একটু আলো, চোখ ঈষৎ ফেটি-মুক্ত হোক, সে তো ধৃতরাষ্ট্র নয়। আলিঙ্গনের মধ্যে শত অসুরের শক্তি জমাট। সালামৎ আলি তবু ভেবেছিল, একবার জাপটে ধরব, তারপর কয়েকটা ঘুষি। হাত ঠুঁটো, তা হিসেবে মধ্যে ধরে নি। নিছক প্রতিশোধপরায়ণতা মগজ ঘুলিয়ে দেয়।

চোখের কোটরে পেশীগুলো তড়পে উঠল, প্রথমে ধিকিধিকি, তারপর হঠাৎ দ্রুত কম্পন শুরু হয় চারিদিকে। কন্ধকাটা ভূত প্রেত ঢের বেশী সুখী। সালামৎ আলির মনে কথাটা খেলে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাকে কিছু ভাবতে হয় নি।

এখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সে খুলি চুরমার করে ফেলতে পারত।

কিন্তু কোথায় দেওয়াল? প্রাচীরের এত ভয় মানুষের, যদিও আততায়ীর আশঙ্কায় সে নিজের চারদিকে অমন কঠিন বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। আজব ধাঁধাঁ অস্তিত্বের। যা বিষ, তাই আবার বিষহর। মাত্রা, সময়, স্থান, পরিবেশের নক্‌শা অনুযায়ী মূল্য বিচারে সব হেরফের হয়ে যায়।

আশেপাশে কোন দেওয়াল আছে কী? সান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু প্রশ্নের কোন বালাই ছিল না। পিপাসায় এক সময় ছাতি ফাটার উপক্রম, তবু পানি চায় নি সে প্রহরীর কাছ থেকে। গ্রামে এক খাল পার হওয়ার সময়ে সে স্রোতে মুখ ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই একবার মাত্র পিপাসার মোকাবিলায় জয়ী। এখনও জয়ী। কারণ আর পানির দরকার হয় নি।

ক্ষুধার মত পিপাসাও নেই। সব কামনা এখন আলোর জন্যে।

পৃথিবীকে দেখতে চাই একবার। কারণ, জন্মভূমি বাংলাদেশকে শেষবার না দেখলে মৃত্যু অর্থহীন থেকে যাবে। তাই ত আলোক প্রার্থী আমি। হে পূষণ, তোমার সপ্ত অশ্ববাহিত রথের ঘর্ঘর আর আমি শুনতে পাই না কেন?

সালামৎ আলি আবৃত্তির আকারে উচ্চারণ করতে গেলে, গ্রীবায় খস্‌খস্‌, যেহেতু নীরস, খুক খুক কাশি এসে যায় সহসা। কিন্তু প্রাণের প্রতিধ্বনি-মুখে কে হাতচাপা দিতে পারে? আলো, আলো নয়। তরঙ্গের সঙ্গী। একে অপরের বিকল্প না হলেও, আলো ছাড়া আর কোন ঢেউ দেখা অসম্ভব। তাই ত প্রার্থনা, হে জবাকুসুম সঙ্কাশ মহাদ্যুতি, একবার স্পর্শ দিয়ে যাও। ভক্তের নিবেদন শোনো...।

মুখের পেশী বিকৃত হতে লাগল সালামৎ আলির। এইবার মাথা বুঝি খসে মাটিতে পড়বে। হ্যাণ্ডকাফের উপর সে কপাল রেখে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। একবার ঠেস দেওয়ার ইচ্ছায় সে একটু হেলেছে কি, তখনই সোজা হয়ে পড়ল আবার। এখানে দেওয়াল নেই, থাম নেই হয়ত গরাদ নেই যার উপর হাত রেখে মাথা রেখে কয়েদীরা চিরদিন সব অভিলাষ পরিপূর্ণ ভাবমূর্তিরূপে রেখে গেছে পৃথিবীর সব দেশে।

সালামৎ আলির হুঁশ আবার সহজভাবে ফিরে আসে।

এই এক বিচিত্র শত্রু। নিপীড়নের ফন্দি ফিকির নয়, তার বর্বরমত-পন্থা পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে। শরীরের সহন-ক্ষমতা অনেক দূর যায়, যদি অনুপ্রেরণা নয়, কেবল ছোটখাট অবলম্বন মেলে দুঃসহ যন্ত্রণার সময়। কয়েদখানার জানালার শিক, উদাহরণত, এই ধরনের সামগ্রী।

কিন্তু এখানে কিছু নেই। মরুভূমির মধ্যে এক চিলতে মেঘ পথ-ভ্রান্তের শক্তি যোগাতে পারে। সালামৎ আলির অনুভূতি তাই হাতড়ে বেড়ায় যদি কোথায় কিছু পাওয়া যায়।

একবার চোখ মুখ কুঁচকে সে দমকা নিঃশ্বাস নিলে। বুকের পাঁজরে ফিক ব্যথা এসে জুটল, হাত দিয়ে সংবাহনের কাজ এখানে অল্প উপকারী। কিন্তু ঠুটো অবস্থায় সে কী করবে? তাই হাতকড়া নিয়েই দুই হাত বুকের উপর রাখলে। দম আটকে আসে থেকে থেকে। সালামৎ আলি গলার ভেতর ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ তুললে, জবাই ছাগলের ক্ষেত্রে

যেমন ঘটে ! এই গুমরানি অনেকখানি সোয়াস্তি। কিন্তু শত্রু তার অসহায়তা দেখে আনন্দ পাবে, তা হয় না। আবার গ্রীবাদেশ শব্দহীন। বন্ধ চক্ষু তেড়ে তেড়ে ফেটির কিনারা ছোঁয় মাত্র এবং ব্যথায় আরো নেতিয়ে পড়ে। সালামৎ আলির বক্ষস্পন্দন পর্যন্ত অতি চিমে হয়ে যায়। মাথার ভেতর চক্কর লাগে। সালামৎ ভাবলে, বোধ হয় মৃত্যু সন্নিকট। কিন্তু এই চিন্তা এক জায়গায় আটকা থাকতে পারে না, বরং হঠাৎ উবে যায়।

স্মৃতির পঙ্গপাল মগজের চারপাশ চেয়ে বসে পড়ে।

বিশ্বাসঘাতকতা তাকে জল্লাদের হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ঘাগী মুসলিম লীগারের মুখটা সে দেখতে পেলে। ছিচেল ছুঁচোলো মুখ, কৃশ চেহারা, তাই আবার বেটে-খাটো এই শুয়োরের বাচ্চা আবার তার প্রভুদের কায়দায় নামের শেষে বিক্রমপুরী জুড়েছিল। ধূর্তামি ওর চোখে মুখে স্পষ্ট। চিরকুমার। সমাজের জন্য জীবন বিকিয়ে দিতে পারত খুব সহজে। মহৎ নামে পরিচিত হোত কিন্তু সব সময় সে সমাজ-বিরোধীদের দোসর। ছোকরাবাজ রূপে প্রসিদ্ধ ছিল সে বিক্রমপুর তল্লাটে। আজও খসলৎ বর্তমান আছে। এই বয়সে, ষাটের উর্ধ্বে, এখনও বিক্রমপুরী কারো ক্ষতি সাধন, বিশেষত দেশের ক্ষতি সাধন করবে, বাংলাদেশে যখন কসাইয়ের দোকান তা ভাবা যায় নি। কিন্তু সে-ই পাঞ্জাবী প্রভুদের আমন্ত্রণ দিয়ে এনেছিল এই অঞ্চলে।

ইসলাম পার্টির ধর্মধ্বজী দালালগুলো সঙ্গে জুটেছিল। নচেৎ অমন অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে তার খোঁজে রাত্রে পঞ্চনদবাসী মিলিটারি হাজির হতে পারে, তা অবিশ্বাস্য।

কত মুখের মিছিল দ্রুত শূন্যতার রাস্তা অতিক্রম করে। মানুষের আধিপত্য সেখানে প্রধান নয়। বাড়ির পোষা কুকুরটা, অস্বাভাবিক শব্দ তুলে তার অনুগমনে কতো দূরে এসেছিল। এক সিপাই গুলি করে তার প্রভুবিচ্ছেদের বেদনা আর স্থায়ী হতে দেয় নি। নভো-চারী রুশ সারমেয় লাইকার নামে সেও কুকুরের নাম রেখেছিল। একটা জন্তুমুখ এই অন্ধকার, এই আলো—এমন ছাড়াছাড়া খাদ আর পথের পালাক্রম সান্নিধ্যের মত—ভেসে উঠতে লাগল, যেমন নদীতে স্নানের সময় তার অভ্যেস ছিল। কুকুরের মধ্যেও মানবিকতার স্পর্শ

পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গী দশজন পাঞ্জাবী সিপাই, এগুলো মুসলমান ...মুসলমান.. কুকুরের কাছাকাছি কোন কালেও যেতে পারবে না।

চীৎকার দিতে গিয়ে ঢোক গিললে সালামৎ আলি। মগজ এখন বড় পরিষ্কার। কিন্তু চিরকালের করুণা রায়ণ মন এবং যার জন্যে সে রাজনীতির ভেতর ঢুকেছিল, হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নিলে আপন স্ব ভাবের বেগে। এ গুলোর আর অপরাধ কতটুকু। এই কুকুরদের মনিবগুলো বসে আছে ইসলামাবাদ শহরে—সেগুলোই আসল জন্তু। নিজের মনে হেসে উঠল সালামৎ আলি এই সময়। রাজধানীর নাম ইসলামাবাদ। ইসলামকে যারা বরবাদ করেছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে এবং যার ঝোপের আড়াল থেকে নিজেদের অর্থলালসা, কাম-লালসা, আয়েস আরামের ঘৃণ্য প্রবৃত্তির রোলার নির্দয় গতি চালু রেখেছে, তারাই শুধু এমন কৌতুক বিতরণে সক্ষম। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে কী আশ্চর্য ভাবে না ঘটে। আজ যেখানে ইসলামাবাদ শহর গড়ে উঠছে তার নাম পাটোয়ার ভ্যালি। এই অধিত্যকা বিশ বছর আগে ডাকাতদের আস্তানা ছিল। বড় ডাকাতরা ছোটদের ভাগিয়ে দিলে। এদের তুলনায় যদিও তারা ছিল দেবদূত বা ফেরেস্তা। তারা একটা দুটো গেরস্থ লুট করে ক্ষ্যান্ত দিত। এরা একটি জাতির সম্পদ লুণ্ঠন নয় শুধু তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হত্যা তাণ্ডবে মেতেছে, সেখানে বর্বরতায় নাদির শাহ, চেঙ্গিজ খান, বা হিটলার দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাংলাদেশের অধিবাসীদের হাড়ের উপর ষোলশ' কোটি টাকার শহরের পত্তন। তারই প্রতিবাদের খেসারৎ দিচ্ছি নিজের জীবন যৌবন দিয়ে ...। সালামৎ আলির মনে হ'ল মাথার ভেতর কি যেন সিদ্ধি ঘোঁট পাকাচ্ছে। আর ত' মাথা কোথাও রাখতে পারব না। এখনই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ব। কিছু ধরা দরকার। শূন্যতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উপায় পর্যন্ত নেই। আলো দাও, আমাকে একটু আলো দাও যেন বাংলার মুখ আমি দেখতে পাই আর একবার। আর একটি বার। এমন চীৎকার ভেতরে নিষ্ক্রমণ-পথের জন্য মাথা কুটছিল।

আর্তনাদ দ্বারা শত্রুকে অনুরোধ করব?

সালামৎ আলি একটু ভাবতে পারলে হাজার যন্ত্রণার মধ্যেও। কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাদের জীবন তারা অত সহজে নিজের ইচ্ছার বশবর্তী

হয় না। না, জন্তুর কাছে মানুষ কিছু চাইতে পারে—এ অস্বাভাবিক। মানুষের ইচ্ছা আদেশরূপে জন্তুর কাছে যায়। এখানে তেমন ব্যবস্থা যখন নেই, নিঃশব্দতাই পরম সঙ্গী!

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

নিজের কাছে প্রশ্ন এবার সোজাসুজি করে বসে সালামৎ আলি। কিন্তু জবাবের জন্য অপেক্ষা করে না। কারণ অনেক ছায়াছবি সে যেন চক্ষুসংলগ্ন ফেটির সমতলে দেখতে পায় ধেয়ে ধেয়ে আসছে, আছড়ে পড়ছে, ভেঙে চুরমার, এবং আবার খণ্ড খণ্ড দিগ্বিদিক বেরিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত-বেগে, তখন সবই যেন অনুপ্রবাহ এবং স্রোতের মত তার অভিঘাত সামনে যা পরে টেনে নিয়ে যায়। হয়ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত সালামৎ আলি। কিন্তু কয়েকটি গুজরে-যাওয়া ঘটনার গুঞ্জরণ কানের কাছে শুধু শব্দমূর্তি রেখে গেল না, আবার ছবি হয়ে উঠল। সর্বপ্রাচীন ছায়াচিত্রের ধারায় নির্বাক।

সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে একটি সহপাঠিনী তার কাছে বেশ ঘন ঘন যাতায়াত করেছিল। সালামৎ আলি সহকর্মীর মর্যাদা দিয়েছিল তাকে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা যেখানে একমাত্র যোগ-সেতু। তারপর ধাপে ধাপে বৃহত্তর সমাজ জগতের এলাকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছিল সালামৎ আলি। ফলে, কাজ অনেক বেশি। এ জেলা সে-জেলা, এ মহকুমা সে-মহকুমা ছুটোছুটি, পার্টির কর্মী সম্মেলন ইত্যাদির চাকায় বাঁধা জীবনে ফরসুৎ ছিল না। মাত্র গত সপ্তাহে সহপাঠিনী তার কাছে খোলাখুলি হৃদয় উন্মোচন করেছিল পত্রযোগে। কাজের ভিড়ে সাক্ষাতের যো ছিল না। তার মধ্যে হঠাৎ দেশের উপর হানাদারদের হামলা-জনিত সঙ্কট। কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বসে গেল। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাকিয়ে ফল্গু আনন্দের রেশ স মৃদু হেসেছিল সালামৎ আলি। সাড়া-উন্মুখ নিজের হৃদয় আর দল মেলার সুযোগ পেলে না। একটি মুখ তাকে আজ বারবার ব্যথিত করে এই ভেবে যে, সে প্রলয়-কালের চূড়ায় আসীন, কিন্তু শেষ চীৎকার দেওয়ার সময় অতিবাহিত। ইথারে কোন বাণী কম্পন আর থাকবে না। বস্তু-পিণ্ডের সঙ্গে সেও জড়ে পরিণত হবে। হিমবাহ পাহাড়ী তরুবৃন্দ সব ভেতরে গুড়িয়ে দিয়ে বরফ আবৃত করে চলে গেল কোন গিরিখাদে সমাহিত হতে।

এত অন্ধকার কেন পৃথিবী জুড়ে ? আমাকে আলো দাও, অতি অস্পষ্ট আলো, যার কাছে জোনাকি মনে হবে প্রদীপ্ত। শুধু নিমেষের জন্য। বাংলার মুখ তার সাহায্যেই দেখা হয়ে যাবে। বুকের ছবি যত ক্ষীণ রশ্মিই হোক চোখের সামনে, দৃশ্যকাব্য রূপে স্ফীত হয়ে উঠবে হাজার যাত্রার হিল্লোলিত স্পন্দনে। এক ফোঁটা আলো পাঠাও, হে মার্তণ্ড দেব তোমার অন্তহীন তেজভাণ্ডার থেকে। এই তমসার অবসান ঃটুক। এক ফোঁটা আলো ... ...।

চোখ তেড়ে কালো ফেটির মধ্যে তাকাতে গেলে সালামৎ আলির মনে হল, মস্তিষ্কের ভেতর কোথায় যেন কি ছিঁড়ে গেছে এবং তার পক্ষে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু যদি চোখ মেলে চাইতে পারত, অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু কে দেবে তাকে আলো ?

অনুরোধ করব শান্ত্রীদের ? ঘৃণায় চোখ মুখ কুঁচকে এলেও অসহ্য লাগছিল সালামৎ আলির কাছে শারীরিক যন্ত্রণার ধাক্কা, যা পথে কতবার না অকারণ শাস্তিমারফৎ পুরস্কাররূপে পাওয়া। না, আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কী হবে যদি এতটুকু মেহেরবানী গ্রহণ করা যায় ? অতি সামান্য দয়া। একবার আমার চোখটা খুলে দাও। এই মিনতি কী জন্তুর কাছে পরাজয় স্বীকার ?

এই জবাবের পূর্বে সালামৎ আলির মৃত ক্ষুৎপিপাসার্ত, প্রহৃত গোটা দেহ জুড়ে এমন তাণ্ডব শুরু হল তার কোন খেয়ালই ছিল না যখন সে চীৎকার দিয়ে উঠল, এই সেপাহী, জারা মেহেরবানী—

—কিয়া মাংতা—?

—মেরা আঁখ কী পট্টি খোল দিজিয়ে।

—কিঁউ।... ...

—তকলীফ কা ওয়াজেহ সে নিহি। মাই জারা দুনিয়াকো দেখ্‌নে মাংতা।

থোড়া রোশনাই। কষ্টের জন্য নয়। আমি দুনিয়াটা একটু দেখে নিতে চাই। একটু আলো।

—রোশনাই।—আচ্ছা—আফসার সে পুছে।

বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

আবার বুটের আওয়াজ নিকটবর্তী।

উর্দু জবান দস্ত ঘোষণা করলে, "এই কয়েদী চলো। তোমকা রোশনাই মেলে উস্‌কা বন্দোবস্ত করে।" (তুমি আলো পাও তার বন্দোবস্ত করি)

—মেহেরবানী।

—মেরা সাথ আও। এই রশি পাকড়ো। বাঙালী কা বাচচা ইধার উধার করেগা তো পেট মে কিরীচ ঘুঁসা দুংগা।

—চালিয়ে।

বন্ধ চক্ষু সময় আন্দাজের বিশেষ বাগড়া সালামৎ আলি ঠাউর করতে পারে না কতক্ষণ সময় গেল। তবে সে সহজে ধরে ফেলে, কোন দালানের এক বারান্দা থেকে আর এক বারান্দা, কারিডর থেকে করিডরে যেখানে সিঁড়ি—সুতরাং তলা—এক বা দুই বা তিন তলা পার হচ্ছে। হয়ত দশ পনর মিনি।

সালামৎ তার হদিস দিতে পারবে না, কিন্তু তার পায়ে কোন জড়তা ছিল না। প্রতীক্ষিত আশা যখন হাতে; কাছে আসে তখন দ্রুততার গুণ্ডা যে-কোন মানুষকে উদ্বিগ্ন ব্যস্ততায় কাবু করে ফেলে। সালামৎ আলি তার কোন ব্যতিক্রম নয়। সজীবতা ফিরে এসেছিল তার দুই পায়ে, যদিও লুঙির তলায় ঠিক হাঁটুর নীচে সাইকেল চেনের পটাপট আঘাতে শুধু লুঙি নয় চামড়া পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল দগদগে ঘায়ের পরিণতি সহ। জ্বালা ধরে বৈকি ওই সব জায়গায় চলাকালীন লুঙির ঘষড়ানির চোটে। সালামৎ আলি কিন্তু যেন সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বলোক-বিহারী। আর একটু পরেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারপর আসন্ন নয় অবধারিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা। কারণ, এপর্যন্ত এমন জন্তুদের কবল থেকে কেউ আর ফিরে আসে নি, দান্তে বর্ণিত দোজখ দরজার সাইনবোর্ড এরা গোটা বাংলাদেশের উপর টাঙিয়ে দিয়েছে। 'সর্ব আশা পরিত্যাগ করিয়া আসিও যাহারা প্রবেশার্থী।'

—রোকো। সহসা সান্ত্রী হেঁকে উঠল।

থামলে সালামৎ আলি।

একটা দরজা খোলার শব্দ। কিছু কিছু ফিসফাস রব।

সিপাই তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে, সালামৎ আলি তা পরিষ্কার টের পায়। হাতে, হ্যাণ্ডকাফ যথারীতি মজুদ।

—তোম রোশনাই মাংতা ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আব তোমরা ফেটি খোল্ দেতা।

ব্যাকুলতা সালামৎ আলির আঙুলগুলো মৃদু কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, যেন সকালের হাওয়া।

—আচ্ছ, আব রেডি হো যাও।

সিপাইয়ের কণ্ঠস্বর।

—ঠিক হ্যায়।

খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলে সালামৎ আলি।

একটানে সালামৎ আলির চোখের ফেটি খুলে গেল। আগ্রহী অধীর বন্ধ চক্ষুর যেটি উন্মোচন মাত্র তার মনে হ'ল যেন জ্বলন্ত তীর অক্ষিপটে এসে বিঁধল। মাথায় বোঁ বোঁ চক্কর অতি দ্রুত এবং ক্রমশ বেগবর্ধিত হুঁশের বনিয়াদ ভেঙে খানখান করে ফেলছে।

মূর্খ বেদ-উপনিষদের ঋষিবৃন্দ, যাঁরা লিখেছিলেন, "অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে যাও, তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

প্রায় অচেতন তবু একেবারে মূর্ছিত, চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে সালামৎ আলি চেতনার স্বাক্ষর পাঠ করে ফেললে নিমেষেই। জায়গাটা টর্চার চেম্বার বা নির্যাতন কক্ষ। স্থানীয় ভাষায় ধোলাইখানা। তার মাথার উপর পাঁচশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে, যা হেঁকে হেঁকে বলছে—'দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না ; হয় তাদের ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।'

বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া

বারুদের গন্ধ আর ভাল লাগে না।

ক্যাপ্টেন বশীর নিজের মনে বিড়বিড় করলে। মহকুমা কাচারির পাশেই এই বিল্ডিং সে অফিস বানিয়ে নিয়েছিল গত চার মাস। এলাকার লোক শান্তিপ্রিয়। তেমন কোন গোলমাল করেনি কেউ। 'সব সাচ্চা মুসলমান। সবাই পাকিস্তান চায়। এই দিক থেকে ক্যাপ্টেন বশীর নিশ্চিন্ত ছিল। মাঝে মাঝে গোয়েন্দারা দু'চারটে কালো ভেড়ার খবর। আনত তাদের রাস্তার কাঁটার মত সরিয়ে ফেলতে বেশী দেরী হোত না। গেরেপ্তার করে নিয়ে আসা এবং দিন শেষ হওয়ার যা অপেক্ষা। অন্ধকারে তারপর পাকিস্তান-বিরোধী নিমকহারামদের আর কোন নাম-নিশানা থাকত না দুনিয়ায়। বিলম্ব অথবা প্রকাশ্যে শাস্তি দিলে ফল খারাপ হয়, তা ক্যাপ্টেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিল এই এলাকায় নয়, অন্য অঞ্চলে।

কলেজের এক ছাত্রকে ধরে এনেছিল জওয়ানেরা। রেল লাইনের ধারে তার গতিবিধি কেমন সন্দেহজনক ঠেকেছিল। তাই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে আনা। তাকে সওয়াল-জওয়াবের ফেরে ফেলেছিল ক্যাপ্টেন নিজে, কাজেই কথাগুলো এখনও কানে বাজতে থাকে:

—তৌম কোন হো ?

—স্টুডেণ্ট।

ষোল-সতর বছরের ফর্সা যুবক। শীর্ণ দেহ। মুখে মেয়েলি ধরনের ছাপ থাকলেও কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব ছিল না।

—ডরতি নেহি ?

—কিউ ?

—স্টুডেণ্ট লোগ বড়া বদমাস। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ করতা হ্যায়, শোর মাচাতা হ্যায়। উসকা সাজা ভি হামলোগ দিয়া।

ঠিক হ্যায়।

সায় শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন, তাই সন্দেহ পরিষ্কারে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিয়া ঠিক হ্যায় ?'

—সব ঠিক হ্যায়।

বেশ ভেতরে ভেতরে গর্মে উঠেছিল তখন ক্যাপ্টেন বশীর, তবু ঠাণ্ডা মেজাজে কথাগুলোর সঠিক হদিস ধরতে তৎপর। আবার প্রশ্ন। আবার জবাব, সেই জবাব। পাঁচ মিনিট এই ভাবে চলার পর বশীর ক্যাপ্টেন আর মেজাজ রাখতে পারেনি। চীৎকার দিয়ে উঠেছিল, 'কিয়া ডরতা নেহি?' তার কোন জবাব দেয়নি কয়েদী, বরং সোজাসুজি ক্যাপ্টেনের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বড় অদ্ভুত দৃষ্টি। সেখানে চ্যালেঞ্জের ভংগী নেই, ঘৃণা নেই, ভীতি নেই। অসহায়তার লেশ মাত্র অনুপস্থিত। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল প্রশ্নকর্তা। আরো এক পাহারাদার জওয়ান স্টেনগান হাতে মজা দেখছিল। চেয়ারে উপবিষ্ট ক্যাপ্টেন। সামনে আসামী। টেবিলের উপরে রাখা একটা রিভলভার। হঠাৎ মরিয়া কয়েদী সেদিকে হাত বাড়াতে পারে। সান্ত্রীর মনে একথা উদয় হওয়ার ফলে তার সতর্কতা আরো বেড়ে গিয়ে ছিল। কিন্তু কি মনে করে ক্যাপ্টেন আর সোজাসুজি পথে না গিয়ে কয়েদীকে কয়েক দিন হাজতে রাখতে হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু গারদের মধ্যেই সেই তরুণের মৃত্যু সংবাদ আসে পর দিন। জোয়ানদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির ফলে নাকি দুই সিপাই তাকে বেদম লাথি দিয়েছিল। শীর্ণ লতের একহারা চেহারা, তাগড়া পাঞ্জাবীর সবুট গোড়ালির আঘাত বেশীক্ষণ সইতে পারেনি। ক্যাপ্টেন বশীর খবর পেয়ে ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছিল। সব সিপাইদের সে কোর্ট মার্শাল করবে। এক জোড়া চোখের প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারেনি। তাই অমন তুমুল গোস্বা। কিন্তু এক সিপাই তখন সাহস করে বলেছিল, 'আপ জানতে নেহি এই বাঙ্গালী কা বাচচালোগ কিয়া হ্যায়?

বাঙ্গালী —।

শব্দটা ক্যাপ্টেন বশীরের কাছে তখন মনে হয়েছিল যেন অবলম্বন,— সাঁতার-অনভিজ্ঞ ডুবে যাওয়ার সময় যা অন্বেষণ করে। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল ক্যাপ্টেন। একবার মনে হয়েছিল, মৃত লাশের চোখ দুটো সে দেখবে : তেমনি দীপ্ত, রহস্যময় কিনা। কিন্তু আর সাহস পায়নি। সৈনিক জীবনে আবেগের অত মূল্য দিলে ফকিরী নিতে হয়। তাছাড়া অফিসারদের মেসে যা আলোচনা হয়েছিল গত সপ্তাহে, সেখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে : বাংলাদেশের জন্য মানে পাকিস্তান বরবাদ। বছর বছর ডিফেন্সের আড়াই শো কোটি টাকা গচ্চা কে বহন

করবে ? অতএব, বাঙালীদের ওপর কড়া শাসন ছাড়া সব অচল হয়ে যাবে...ইত্যাদি ইত্যাদি। আবেগ যেভাবে ঝেড়ে ফেলেছিল ক্যাপ্টেন বশীর দুই চোখের দৃষ্টি তেমনভাবে মুছে ফেলতে পারেনি সেদিন। সন্ধ্যায় অন্য এলাকা থেকে আগত আরো দুই অফিসারসহ বহুৎ স্কচ হুইস্কি পানের মধ্যেও তার মনে হয়েছিল, এক তরুণ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তাই সিগারেটের পর সিগারেট টেনে রাশ রাশ ধোঁয়া ছেড়ে এবং হাম পেয়ালাদের সঙ্গে কিছু খিস্তিজাত রসিকতায় ডুবে থাকলেও স্বস্তি ছিল না ক্যাপ্টেনের।

সেই জন্যেই হয়ত সে হঠাৎ-হঠাৎ নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠত, 'বারুদের গন্ধ আর ভাল লাগে না।' কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ পাকিস্তানী হিসেবে ক্যাপ্টেনের খ্যাতি গোটা জেলায়। কোন সামরিক অপারেশনে গেলে ক্যাপ্টেন বশীর কোন অফিসারসুলভ আত্মাভিমান রাখত না। একটা নিরক্ষর জওয়ানের পক্ষে যা সম্ভব, সেও তা করতে সক্ষম ছিল। গর্ভিণী মেয়ের স্ফীত উদরে বেয়নেট সে নিঃসংকোচ ঢুকিয়ে দিতে পারত। মৈথুনরত কুকুর কুকুরীর পাশে প্রজনন মৌসুমে আরো কুকুর যেমন নিজেদের পালার প্রত্যাশালাভে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যান্য জোয়ানদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন তেমনি একবার অপেক্ষা করেছিল, একটি রমণী যখন পাঁচজনের শিকার। জওয়ান এবং অফিসার একই আসনে সমাগত। ইসলামী সাম্যের এমন পরিচয় দিতে ক্যাপ্টেন বশীর কোনদিন পেছপা হয়নি। অথচ মাঝে মাঝে দুটো চোখ—তা-ও কবেকার মৃত চোখ কেন জানি, বিভীষিকার মত তার পিছু নিয়েছিল। হয়ত অতীতের কো জের। হাজার হোক, লাহোর এচিশন কলেজেপড়া শরীফ খান্দানের ছেলে,-একদা মীর তকী গালিবের কাব্যপিপাসু, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-ফেরত, অমন শৌখিন চেহারা, ধোপ-দুরস্ত ইউনিফর্ম—সৌন্দর্যের প্রতি কিছু টান থাকবে বৈকি। সুতরাং চোখের মায়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কবিমাত্রে নয়ন-তপস্বী। হয়ত অতীতের জের—।

কিন্তু এসব হামেহাল ব্যাপার বা পদে পদে অঘটন ঘটায়নি কোনদিন। দুটো চোখ যেন 'এ্যামবুশ' করে থাকে বহু শরাবের তন্দ্রায়—যার মোকাবিলা সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন বশীর অফিসে বসেছিল আনমনা। জানালা-পথে বিরাট সবুজ প্রান্তর দেদার বিস্তৃতি নিয়ে দূরে এক গ্রামের রেখার ভেতর ঢুকে গেছে।

তেমন কোন তাড়াহুড়ার কাজ নেই। বাংলাদেশে বর্ষার আকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বাইরে তাকালে মনে হয়, সবই শান্ত। গোটা দেশ শান্ত। তেমন কোন চিন্তা বশীরকে আচ্ছন্ন করে থাকেনি। তবু হঠাৎ বিড়বিড় উচ্চারণ করে ফেলেছিল, 'বারুদের গন্ধ আর ভাল লাগে না।' মুখ থেকে শব্দ বেরিয়ে যাওয়ার পর তার হুঁশ হয়। তখনই অসোয়াস্তির আরম্ভ। আর সুন্দর অভিনব চোখ দুটো তার চোখের দৃষ্টি তখনই মাড়িয়ে যেতে লাগল। এই উৎপাত থেকে রেহাই পেতে কিছু ভাবুকতার আশ্রয় নিতে গেল ক্যাপ্টেন সাহেব, বাইরের দৃশ্য যখন দূরে দূরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কোন কাজ হল না। দেরাজ থেকে তখন বীয়ারের বোতল, গ্লাস বের করে ঢকঢক এক চোঁ দিয়ে অনেকখানি হলকুমের ওদিকে পাঠিয়ে দিলে। ঝাঁজ কড়া। কিছু কাজ দিলে বৈকি। ক্যাপ্টেন বশীর তখন স্মৃতিচারণার দিকে ধাইলে। লাহোরের তিক্কা-চাপলী সহযোগে ইয়ারী সন্ধ্যা, হীরামন্ডিতে পিতার রক্ষিতা, পারিবারিক কলহ, ইরাবতীর কোলাহল, টাংগাওয়ালার চীৎকার, আনারকলির ভিড় ... ... ।

কিন্তু সোয়াস্তি পরমুহূর্তে আরো ঘনিয়ে আসে। বরং আত্মসমীক্ষা কিছু আনন্দ দিতে পারে। মাঝে মাঝে বিপরীত আচরণ কোথা থেকে আসে? ক্যাপ্টেন ঠিকই আঁচ করেছিল। বীয়ারের চেয়ে আরো ঝাঁজালো নিজের দিকে তাকানোর চেষ্টা, নিজেকেই কসাইয়ের মত কুঁচি কুঁচি কাটা। তা যেন মেক্সিকোর নির্জলা 'রাম'। নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিল ক্যাপ্টেন বশীর---মীরণশাহ কবরস্তান থেকে কথাশিল্পী মরহুম সাদাৎ হোসেন মিণ্টু বেরিয়ে এলে সে এমন বিস্মিত হত না। বিপরীত আচরণ আসে কোথা থেকে? নিজের জিজ্ঞাসার পিছু পিছু তখন দৌড়াতে থাকে ক্যাপ্টেন বশীর। মনে পড়ে, চার মাস আগে এখানে বদলী হওয়ার আগেকার এক দুপুরের দৃশ্যাবলী।

বাংলাদেশের চৌষট্টি হাজার অন্যতম এক গ্রামে তারা অপারেশনে গিয়েছিল মহকুমা সড়কের পাশে অবস্থান বিধায় জীপ-লরী ইত্যাদি নিয়ে প্রায় একশো জন সিপাই। সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে, তা বলা বাহুল্য। একদিন আগে এই পথে মুক্তিবাহিনী একটা ব্রীজ উড়িয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা জীপ। যার ভেতরে ছিল অফিসারসহ আরো চার

জওয়ান। সকলেই ফৌৎ হয়। তারই বদ্‌লা। ভোর হওয়ার আগেই তারা গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলেছিল। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন। নির্বিচার হত্যা, অগ্নিদাহ, লুট। রমণীর চীৎকার, আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা, প্রাণভীত মানব-মানবীর দৌড়, বেয়নেটে গাঁথা শিশু, মেশিনগানের খটখট রব—নারকীয় তাণ্ডবের নানা অধ্যায়। বিরাট গ্রাম। বহুজন-অধ্যুষিত। ঝোপঝাড়, বাঁশবন পরিপূর্ণ। অনেক সময় লেগেছিল। একতরফা যুদ্ধ। এখানে প্রতিবাদ শুধু হাহাকার, ক্রন্দন এবং অবধারিত মৃত্যুর মুখে পৃথিবীকে এক লহমা দেখার আকুলতা—স্নেহ-মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছেঁড়ার অসম্ভব প্রয়াস। বড় গ্রাম, তাই শেষ হয়েও শেষ হয় না। লুটের জন্য আরো বিলম্ব ঘটে। ধ্বংসের লেলিহান জিভ তাই সংযত করতে হয় কোন এক সময়। এক হিসেবী সিপায়ের হিসাব অনুযায়ী শিশুনারী পুরুষ মিলে পাঁচ শো মৃত, দুহাজার অন্তত জখম।

এই দলের পরিচালক ক্যাপ্টেন বশীর। নিজের সঙ্গে আরো চৌদ্দজন জওয়ান। সামনে পড়ল একটা টিনের ঘর। আশপাশ দেখে মনে হয়, এককালে অবস্থা ভাল ছিল। বাড়ীর সামনে টিনের ফটক। বশীরের নির্দেশে আর কেউ গুলি ছোঁড়েনি। আর বেশী লাভ নেই আতংক বাড়িয়ে।

ফটকে লাথি মেরেছিল এক জওয়ান। ঢনঢন শব্দ চতুর্দিকের নারকীয় আবহাওয়ার মধ্যে যেন কেয়ামতের ঘোষণা।

এক বৃদ্ধ ফটক খুলে দিয়েছিল। দাড়ীধারী জয়ীফ মানুষ। তাই এক জওয়ান হাত তুলেও নামিয়ে নিল। ভিড়ভিড় দল বেঁধে সিপাইরা ঢুকে গেল। হাতে উঁচানো হাল্কা মেশিনগান। কারো কারো হাতে রাইফেল।

সকলকে কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

উঠানে সাদা চাদর ঢাকা কী যেন খাটের ওপর। লাশই হবে। তা কান্না বুঝতে দেরী হয় না। অস্পষ্ট শব্দে কলেমা শাহাদাৎ পড়ছে তিন-চারজন। একজন কোরান মজিদ তেলাওয়াতরত। খাটের কিনারায় মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল দুই সুঠামদেহী তরুণী। এক একবার মুখ তুলছে তারা। দুই জনে যুবতী। আলুথালু চুল এবং কান্নায় কান্নায় কোটরগত চোখ। ডুকরে কেঁদে উঠল একজন। লাশ, হ্যাঁ লাশ। তিন চারটে লোবানদান থেকে ধোঁয়া উঠছে। তারই গন্ধে জায়গাটা যেন গোটা বসুন্ধরা থেকে নির্বাসিত। একদম মৃত্যুর পরিবেশ।

ক্যাপ্টেন কী নির্দেশ দেয় তারই প্রতীক্ষায় সিপাইবৃন্দ।

বশীর এক সময় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কৈ সে মরা ?' কি ভাবে মরল ?

—বুখার থা ।

কলেমা শাহাদাৎ পাঠক একজন জবাব দিয়েছিল। যুবতী যুগলের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল ক্যাপ্টেন এবং তার অনুচরবৃন্দ। হামলাকারীরা সকলে স্তব্ধ। আওয়াজ তুলছিল শুধু পবিত্রগ্রন্থ পাঠক এবং কলেমা উচ্চারণকারিগণ। ঈষৎ বাতাসে লোবানের ধোঁয়া সকলের নাকেমুখে এসে লাগে। তার সর্পিল কুণ্ডলী আকার ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যায়।

আরো পাঁচ মিনিট।

শেষে ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিয়েছিল, 'চলো ইয়ার। ছোড়ো আজ বহুৎ হুয়া'। সবাই একে একে উঠান পরিত্যাগ করল, হয়ত লাশ দেখার খায়েস তাদের সেদিনের মত মিটে গিয়েছিল, পূর্বে বহু মৃতদেহ দেখার ফলে।

জিঘাংসার জায়গায় এমন বৈরাগ্যের উদয় সম্পর্কে ক্যাপ্টেন বশীর আজ হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। নিজের অফিসের কামরায় বসে বসে কিন্তু কোন জবাব পেল না। এমন অস্বস্তি। কিন্তু তার পেছনে নিরাবিল কী যেন আনন্দের রেশ ছিল। তাই আর সঠিক জবাবের জন্য কোন কৌতূহল রইল না তার।

সদুত্তর পেত বৈকি ক্যাপ্টেন বশীর, যদি ওই উঠানের পরবর্তী দৃশ্যাবলী তার চোখে পড়ত।

আরো দু'ঘণ্টা পরে।

হানাদার সেনারা একে একে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে তখন দিনের আলো আর কোথাও নেই। একটা পিদিম জেলে এনেছিল যুবতীদের একজন। অস্পষ্ট আলো খাটের পাশে। তখন লাশের সিথানে কলেমাপাঠক দরুদ বন্ধ করে, ফিসফিস ডাক দিয়েছিল, রণেশ-দা এবার ওঠেন।

কথা শেষ হয়নি সাদা চাদর ঠেলে লাশ ধড়মড়িয়ে ওঠে, লাফ দিয়ে খাটের বাইরে। তারপর আবার খাটের কিনারায় এবং পাশ থেকে স্টেনগান হাতে নিয়ে দ্রুত বলে চলেছিল এক সুদেহী যুবক "তাড়াতাড়ি

করো এই অন্ধকারেই সখিনা, তহমিনা (যুবতীদের দিকে নির্দেশ)কে কোন নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যেতে হবে, আমি জানতাম।''

খাটের অন্য পাশ থেকে দুটো রাইফেল হাতে নিয়ে এক কলেমা-পাঠক (পাঠ আগেই বন্ধ) জিজ্ঞেস করলে, 'কী জানতেন?'

জবাব এলো তখনই, 'স্বাভাবিক মৃত্যুর কাছে, অপমৃত্যু নিয়ে যাদের কারবার এমন বর্বরও নাড়া খায়। বাজি ধরেছিলাম। এখন দেখছি ঠিক ঠিক কাজে লেগে গেছে।'

''দাদা, ভাই কী সৌভাগ্য আমাদের। আপনার মত গেরিলাবাহিনীর লীডার পেয়েছি। শুধু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে''—কিন্তু মন্তব্য শেষ হওয়ার আগেই সদ্য জীবিত ব্যক্তি খেঁকিয়ে উঠল, ''আহ, কথা ছাড়ো। ওদের বর্বরতার শাস্তি দেওয়ার আগে আর কোন কথা না। জলদি—বোন সখিনা, তহমিনা—জলদি যা পারো সঙ্গে নাও জলদি।''

গেরিলা লীডার দাশগুপ্ত অতি তরীবতের সঙ্গে তারপর নিজের স্টেনগান বাগিয়ে ধরেছিল যেন তখনই শত্রুর মোকাবিলার জন্যে সে প্রস্তুত।

সারেঙ সুখানী

আর থোড়া অক্ত।

আর কিছু সময়।

অনন্তের সুড়ঙ্গে এই হামাগুড়ি আর কতক্ষণ দেওয়া যায় ?

সোলেমান সারেঙের কাছে তখন কি প্রশ্ন বার বার ঘাই মেরেছিল, তা আজ জানার কথা নয়।

কারণ, মুহূর্ত নির্যাস হয়ে এলে অনেক ছবি, অনেক কথা, ঘটনা একাকার যে রূপপরিগ্রহ করে তা নিতান্ত অনুভবের ব্যাপার। ক্যামেরার লেন্স অতিদ্রুত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই ফিল্মের সমতলে নানা ছাপ সংগ্রহ সহজ। তার পাঠ উদ্ধারও সম্ভব। সেখানে একক ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ঘটনা আবেগ-প্রবাহ যখন তেমন কায়দায় গতির চোটে একটার পর একটা—একটার ভিতর একটা সেঁধিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জানান দেওয়ার দাবি হাঁক-ফুকর ছড়াতে থাকে, তখন অর্থহীনতার কাছে সব সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু অনুভূতি কি অমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায় ?

মানুষের ধুক্‌পুক্ বুক থেকেই ত সব আসে।

দক্ষিণ আকাশে মেঘ ধরেছিল, বাতাসের তোড় সঙ্গে। সর্বনাশী মেঘনা খালি হাসে আর হাসে। খল্‌খল্ বালিকা-কন্যার কচি দাঁত, তিনটে পোকায় খাওয়া। উঠানে মুরগীগুলো কট্ কট্ করে খালি আওয়াজ তুলতেই জানে। নাম নেই ডিম দেওয়ার। সামনে ঈদের পরবে বেশ কয়েকটা হালাল করা যেতে পারে। বন্যার পর চরে যে পলিমাটি পড়েছে, চৌগুণ ফসল হতে বাধ্য। নির্জন চরের বিস্তার এক একবার অমন ঝলসে

উঠে কেন রোদ্রে ? অবিরল কল্‌কল্‌ আকাশ উপুড় হয়ে আঁজলা আঁজলা জল খায়, পিঠে রঙ্গীন বাদাম উড়িয়ে, মাটির ধার ধারে না। নেহাৎ যদি ইজ্জৎ বিস্মৃতি ঘটে গাছপালা জাপটে ধরে, যা সবুজ বিষে মৃত। তাই তারও হরিৎতর। গ্রীষ্মের ধূ ধূ চর। হা হা বাতাস। হা-হা—

পায়ে হেঁটে যতদূর যাও এই বাওড় ধরে আর এক বাওড়ে বাতাসে আর কোন বোল নেই। রাঙতাখালি, পায়রাচালি, নিশ্চিন্দিপুর, দরিয়াগাছি—অন্তত এমন ত্রিশটা গ্রাম মাতম করেছে মহরমের। এখানে জারি কেবল আহা-জারী। নাসিমন খালার ছেলে ষণ্ডা জোয়ান তালেবের ভাইজান—ডাকে পাথর গলে যেত। ছেলেবেলায় বলতো, "সোলেমান দাদাভাই, চলেন অহন হাডে যাই।" পাপড় খাওয়ার শখ। এক পয়সাতেই খুশী। তালেব হাঁটিছে দ্রুত। চার বছর, ছয় বছর—আট বছর—কুড়ি বছরের তালেব। কি জল্‌দি জল্‌দি কালো চেহারা জলতরঙ্গে সুরের মত নিজের পরিবেশ ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়ত। পাগল, পানের দোকান দিয়েছিল বক্‌সী বাজারে। পানের চেয়ে গান বেচত বেশী, সদা গুন্‌গুনে। ভাইজান ডাক শোনা যায়। অবিরল জলকল্লোল যতই প্রচণ্ড হোক, আদরের আহ্বান তা ছাপিয়ে উঠে। কারণ তাকে বাতাস কোল দেয়। কোল দেয় মনুষ্যকণ্ঠের সম্মাননায়। স্টীমারের হুইসেল আদমের ছেলেরাই বানায়। বাঁই-বাঁই ঝড়ে আকাশ মাতাল যখন টলে টলে পড়ে, তার ধকল যায় লঞ্চ স্টীমারের উপর দিয়ে। যেন সাঙাতে সাঙাতে অনিয়ম মশ্‌করা। তালেবের পানের দোকান পুড়ে গেছে। সে ভিতরেই ছিল। বাইরে বেরোলে মেশিনগানের গুলী খেয়ে জান যায়। পুড়ে মরে যাওয়ার ছেলে সে নয়। ফেরৎ যখন আসেনি, মরণের হাদিস তাউড়ে মুনাফা কোথায় ? বাতাস গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে নাসিমন খালার মত, নির্বাক পাথর। ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন—বেশক এলাহীর কাজেই ফিরে আসে। জাহাজের স্টীয়ারিং হুইল ধরে দরিয়ার রহমান চাতালে চোখ রেখে রেখে তালেবের মুখ আঁকবার চেষ্টা করা যায়। দুরন্ত ঢেউ সব মুছে দিতেই যেন অমন দাবড়ি মেরে উঠে। কত পানি দেখলাম সেই জোয়ান কাল থেকে। বয়লার থেকে শুরু, হুইলে এসে শেষ হচ্ছে। চোখের পানি আর কত ভয় দেখাতে পারে ? সব পানি শুকিয়ে যাক্‌, সব অশ্রু শেষ হয়ে যাক্‌, মরুভূমি হোক বাংলাদেশ। আর কেউ মক্কায় যাবে না অত খরচ করে। একটা খায়েস ছিল। কোম্পানীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বড়

দরিয়া পার জেদ্দা মক্কা যাওয়ার। একটি রঙীন হাজী তোয়ালে কাঁধে ফেলে মুন্সীপাড়ার নসরুদ্দীন হাজী মুরগীর পালে মোরগের মত বুক চেতিয়ে চেতিয়ে কি হাঁটে! আল্লাহর মর্জির উপর কোন চারা নেই। কিন্তু সিনা চেতিয়ে হাঁটার দিন চলে গেল এক ফুঁয়ে। এত চীৎকার চতুর্দিকে। এত বাঁশের লাঠি আকাশমুখী গুন্‌তির বাইরে। হাজার, লক্ষ, কোটি। ঝিরিঝিরি ঢেউয়ে যেন স্টীমার দুলছে। এত উন্মাদনা কোথায় ছিল এতদিন? কাওন ধানের চারা জমিনের ভিতর লুকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দ্যাখো রাতারাতি সব মোতায়েন দাঁড়িয়ে গেছে গণ্ডায় গণ্ডায় নয়, লাখে লাখে কাতারবন্দী। সুরযের রোশনাইয়ে গা ধুচ্ছে। কাওন ধানের ছাওয়াল শেখ মুজিবের দ্যাশের মানু। ঝিরিঝিরি ঢেউয়ে লঞ্চ দুল্‌ছিল। তারপর ঝড়ের সঙ্গে আড়ি, নোঙর ছিঁড়ে দৌড় দিলে সমান পাল্লা। এক সঙ্গে এত মানু আর কোনদিন দেখা যায়নি। সব আল্লাহর আশমানের তলায়। যেন কারও ঘর নেই। ঘর নেই। কিন্তু দেশ আছে। তাই বেরিয়ে এসেছে কাওন ধানের চারা-পুঞ্জ মাটির আঁকড় ঠেলে। অথচ দম্‌কা ঝড়ে সব আবার লণ্ড-ভণ্ড। কিন্তু লাখ-লাখ লাঠি যা আস্পর্ধা, হিমাকতের মত উঁচিয়ে উঠেছিল'' তা কি ফুৎকারে নিবে যেতে পারে? তালেব বেঁচে নেই, বেঁচে নেই অনেকে। মাঝিপাড়ার গণেশ মালো শহরে ছোট দোকান দিয়েছিল। পেছনে খুপ্‌রি ঘরে বউ-ছেলে নিয়ে থাক্‌তো। বর্ষাকালে যাতায়াতের কষ্ট। তা ছাড়া দোকান বন্ধ যায়। মা লক্ষ্মী রাগ করে। গণেশ মালোরা আর শীতলপুর গাঁয়ে আসবে না। বংশ ধ্বংস। আল্লার ইনসাফ আছে? তরীক মসিয়র, গফুর, বামা মাইতি, ইনাম মৃধার ভাই রাশেদ, অমিত, অমিয়, গোলাম কাসেম, বশীর, শীতলপুর আর তালশহর দুই ইউনিয়নের আড়াই শ' মানুষ মারা গেছে মাত্র পাঁচ দিনে ... । তালেব লাঠি ছেড়ে বন্দুক ধরবে বইকি! ত্রিপুরা, দিনাজপুর, গারো পাহাড়, সিলেট, সুনামগঞ্জে যারা বন্দুক রাইফেল নিয়ে লড়ছে, তাদের সকলে নাম দিয়েছে মুক্তিফৌজে। এত লাখ-লাখ লাঠির আস্পর্ধা কি বৃথা যেতে পারে? কাওন ধানের চারা অত নরম তবুও ঝড় বাতাসের সঙ্গে লড়ে বইকি! বাঁচার জন্যই লড়ে। সব লণ্ড-ভণ্ড-ভাব সাময়িক, যেন হুজুগ। দরিয়ায় কি রোজ তুফান ছোটে? কুতুবদিয়ার বাতিঘর হয়ে যায়

কোন কোন মানুষ। কত অন্ধকারে সার্চ লাইট ফেলেও আর দিকশূল দেখা যায় না। আকাশে তারা কিছু সাহায্য করতে পারে। তাও যখন গায়েব তখন বাতিঘরের দপদপ জ্বলা এবং নেবা আলোই একমাত্র কাণ্ডারা। বদর পীরের দরূদ পড়ার কথা সব সময় খেয়াল থাকে না। আল্লাহ যদি মেহেরবান থাকেন, একবার শেখ মুজিবকে চোখে দেখতে যেন পাই। বড় সাহেব সময়মত ছুটি দিয়েছিলেন, তাই না একসঙ্গে অত মানুষ দেখার নসীব হলো। সাড়ে সাত কোটি লোক। তার ক' হাজার আর সারাজীবনে দেখা সাক্ষাতের ভাগ্য হয়? একসঙ্গে লাখ লাখ বড় সভায় শহরের লোক দেখে। তারা ডাঙ্গায় থাকে। কিন্তু পানির বাসিন্দা প্যাসেঞ্জার দেখে বটে? তা আর একুনে কতো? দু'শ ধরে এই স্টীমারে। চাপা-চাপি গাদাগাদি সাড়ে তিন শ' হয়। সে এই স্টীমারের হদের ভিতর। অনেক জায়গা জুড়ে অনেক লোক আর ক'জন দেখে? দেশত' মানুষ গাছপালা নদ-নদী আরও কত কি মিলে। একজন মানুষের ডাকে যখন লাখলাখ লোক জড়ো হয়, আরো কোটি কোটি সাড়া দেয় যে যেখানেই যাক সেই মানুষটাকে দেখলেই তো সব পাওয়া হয়ে যায়। আল্লা হেন নসীবে তা রাখেন। না, কিছুই রাখেননি। এই দুঃখ কি কোন দিন মিটবে? বড় সাহেবের কাছে আর ছুটি নেওয়ার জন্য যেতে হবে না। বাঙালীদের মধ্যে জাহাজ কোম্পানীর বড় সাহেব। তাই তিনিও শহীদের দলে। পাঞ্জাবীরা তাঁকে গুলী করে মেরেছে। লঞ্চ আর নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা কি কোন ঘাটেই আর নিয়ে যাব না। সোজা ছোট নদীর ভিতর দূরে নির্জনে কোথাও নোঙর করে রাখব কিছু পার্টস খুলে, যেন কেউ আর চালাতে না পারে। আবার ডাঙার মানুষ ডাঙায় ঘুরবো। সেখানেও কি নিশ্চিন্ত? দাউ দাউ আগুন, পোড়া গ্রাম, জানের ভয়। বন্দরের আকাশ কত বদলে যেত একদিন পানির উপর ভাসা শেষ হলে। সাউদাম্পটন, লিভারপুল, বিন্দিসি, এথেন্স .... তরবেতর মানুষ, ভাষা, আহার, গাছপালা। কিন্তু দেশের জন্য মন পোড়ানি কি শেষ হয়? তাইত দেশী কোম্পানীর খাতায় আবার কর্মচারী হিসাবে নাম লেখানো? এই নদীর কল্‌কলানি কে কানে অহরহ ঢেলে ঢেলে দেবে? কে দেবে এত বালুচেরর চক্‌চকে মাদুর, শীতের ভোরে যেখানে কুমীর শুয়ে আছে? শ্যামা মেবনা শ্যামাসঙ্গীত। বাঁশবনে,

ঝোপঝাড়ের আওতায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় কি থাকে অপরে তা কি জানবে? তাইতো দূর-দেশের ঝলমলে শহর শেষ পর্যন্ত আর টেনে রাখতে পারে না। একটি উঠান, লাউয়ের মাচাঙ, কলসীর চুন-মাখা কানা, তিন চার ঘর প্রতিবেশী, চর অঞ্চলের কলাবন, ধানের ক্ষেত, মিঠা আলুর সটান শোয়া গাছ, অনেক কাকের ডাক—যখন লঞ্চের আওয়াজে হুইসেলে সহসা চঞ্চল। অদৃষ্ট কাছাকাছি কত কিনা এনে দিয়েছিল। বেসুমার নয়। কিন্তু অভাব দাঁত বের করে হাসতে পেতো না কোথাও। না মনের কাছে, না উঠানের উপর। চুড়ির রিনরিন আওয়াজ তা দুনিয়ার সকল সুরের আদি। বয়সের ভাটা হন্যে অস্থিরতা আনেনি জাগতিক চাওয়া পাওয়ার সীমানায়। জাহাজের সারেঙ। সারেঙ, সারেঙ, সাহেবের সম্বোধনে হামবড়া আঁচ থাকত না এতটুকু। শহরের হেড আপিস মাথা-ঘোরা সিঁড়ি গিস্‌সিস্‌ লোক, কেরানী ঝাড়ুদার কত মানুষ। ডাঙা শক্ত নিরেট। শহর আরো নিরেট, কঠিন। পানির তরতরানি দ্যাখো লোকের চলাফেরায় হুশ-শব্দ গাড়ির চম্পটে। সবই সেখানে শক্ত। কোমলতা পানির ধর্ম। বালিকা কন্যার মুখ। স্নেহ, মমতা। বেড়ার গায়ে নীল রং উইপোকা থেকে বাঁচায়। রাস্তার লোক চেয়ে চেয়ে দেখে সারেঙ সাহেবের বাড়ী। আর অদৃষ্ট-গুণে সহকর্মী কি সব জুটেছিল। জব্বার, রাশেদ, আইনু, মতিউর জলিল ...। আইনুর গোটা গ্রাম এখন খাঁ খাঁ পড়ে আছে। পাঞ্জাবী সিপাইদের অত্যাচারে কে কোথায় গেছে তার জানা নেই। সারেঙ-সাব সবাইকে ছেলের মত ভালবেসে নিজেই সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, বেটা ফিরে এসেছে। কাজের ছেলে বয়লারে কয়লা মারতে ঘেমে অস্থির, তবু মুখে গান। ক্রমশ কাজ শিখেছে, উপরের দিকে উঠছে। রাশেদ শুধু একা মারা যায়নি, গোটা পরিবার-সহ বামা মাইতির মত। খামখা... ছুটি নিয়ে গিয়েছিল। কাল ছুটি। মতিউর ফিরে যেতে পেরেছিল যথা সময়ে বৌ-বাচ্চা-সহ এক আত্মীয়ের গ্রামে, তাই বেঁচে গেছে। সব কাজে ওস্‌তাদ। কয়লা মারতে দাও, কাছি টানতে লাগাও, সিঁড়ি ফেলাও। আবার ইঞ্জিন ঘরে ব্যাটা যেন লোক্‌মান হেকিম। চোত-বোশেখের মরা নদী, সব জায়গায় পানি সমান নয়। গরু পার হচ্ছে পিঠে রাখাল। মতিউর হাঁক দিচ্ছে, হাতে বাঁশ। আড়কান্ত এক বাম—এক বাম এক হাত, দুই হাত দুই বাম। জব্বার কোথায়? নিকষ কালো চেহারা। শিশুক বলে

ক্ষ্যাপাত সবাই। পানিতে পড়লে প্রায় তেমনই দেখায়। নেক্‌কার কাজের ছেলে, জব্বার সাঁতার দিচ্ছে। মেঘনার ঢেউএ তার গান এমনি বেরোয়ঃ চ্যাংড়ি বধুয়ারে, ঘর কিইন্যা দ্যাও নদীর এ কিনারে এ...এ। জব্বার কোথায়? নিকটে। দূরে। ইঞ্জিন ঘরে? জব্বার...

হে আল্লা, একটু বাতাস দাও চিৎকার দিই জব্বারকে ডাকার জন্যে। ওকে বড় দরকার। জব্বার, রাশেদ, আইনু, মতিউর, জলিল। সূর্য পাটে নামে। কারবালার শহীদদের রক্তে না কি লাল হয় আকাশ। মেঘনার পানি লালে লাল হয়। একটা মানুষের শরীরে কত রক্ত থাকে? লক্ষ লক্ষ মানুষে আকাশ-লালিমা রচনার কথা ভাবে না। কিন্তু মেঘনা লাল হয়ে যায়। নীলতোয়া মেঘনা সূর্যের রঙে, মানব-মানবীর রক্তে। বামা মাইতি, রাশেদ, আইনু, মতিউর, জলিল। জব্বার নারায়ণগঞ্জে জাহাজ ঘাটায় এক মেয়ের আশানাইয়ে ধরা পড়েছিল। জব্বারমতিউরআইন জলিল—জ—ম—আ—।...

॥ ২ ॥

হয়তো অতলান্তিক, তমসায় শৈত্যে অথবা পুরু কুয়াশার আস্তরণে, এবং যতই নীচে নেমে নেমে যাও মনে হবে, এই যাত্রার শেষ—যেখানে বসুন্ধরা কোল পেতে বসে আছে বন্ধ্যা রমণীর মত অপত্যহীনতার আর্তনাদ সর্বাঙ্গে জারিত; যখন তার চোখের জল নদীর সঙ্গে স্থানবিনিময় সমাপ্তির পর স্বীয় আকার-লুপ্তির শোকে মুহ্যমান পঞ্চভূতের সকল উৎপাদনে যুগপৎ জাতিস্মর হওয়ার প্রচেষ্টায় মত্ত। মানুষের বুকে কিন্তু ধুক-পুক করে কত ক্ষীণগতি এবং দেহযন্ত্রের জটিলতায় নিজেকে সঁপে দিয়েও শক্ত নয় বরং তুলতুলে আওয়াজ তোলে। নরাকারে জন্মানোর খেসারত তাই অনেক। কেবল সংখ্যার নয় প্রকারে। প্রকৃতি, এক উপাদানের নিকট শেষ পর্যন্ত রেহেনী খৎ লিখে দিয়েও খালাস ত পাওয়া যায়ই না, অথচ তাদের বিন্যাস আরও সাঁড়াশীর মত চতুর্দিক থেকে চেপে ধরে আরও নেপথ্যশক্র সৃষ্টি-মারফৎ।

সোলেমান সারেঙের বুকের ধুকধুকানি কবেই থেমে গিয়েছিল। মেঘনার ঢেউ তখনও তাকে পৌঁছতে দেয়নি অনেক নীচে মাটির উপর। দেহের পেশী কি অত সহজে নিষ্ক্রিয় হয়? হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেলেও তাদের স্পন্দন থেমে যায় না। তাইতো স্মৃতি আবেগ আকাঙক্ষা মানবিক চাওয়া-পাওয়ার তৃষ্ণা মিটে গেছে, এমন রায় একান্তভাবে অচল।

স্টীমার থেকে লাফিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সময় সারেঙের হুঁশ এতটুকু টোল খায়নি। সব কাজই সজ্ঞান অতি খবদারীর সঙ্গে পালন করেছে। ঝাঁপ দিয়েছে বোধ হয় সকলের শেষে, যখন অন্যান্য সহকর্মীরা মেঘনার অথৈ জলকেই নিরাপত্তার ঘাঁটি মনে করেছিল। জব্বার ত তার কাছ থেকে ডেকের নিকটস্থ রেলিং টপ্‌কায়। একসঙ্গে অনেক গুলীর শব্দ। জব্বারের পায়ে কিম্বা পিঠে লেগেছে আর হিসেবের দরকার হয়নি। কারণ তার-পরই সোলেমান সারেঙ নিজেও মেঘনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। গুলী লেগেছিল বগল ঘেঁষে পিঠের উপর। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসছে। সুতরাং পানকৌড়ির মত হঠাৎ ডুব, হঠাৎ ভাসা কায়দা আর কতক্ষণ সহায় হতে পারে? সোলেমান সারেঙের এক সময় বুঝতে দেরী হয়নি কাঁধের উপর গুলী গলার এক অংশ চামড়া সহ বিদায় দিয়েছে।

তারপর অথৈ অন্ধকারে হামাগুড়ি। স্মৃতির থাবায় বন্দী। সব মনে পড়ে যায় বইকি। প্রবীণ সারেঙকে বন্দুকের নলের মুখেই ধরে এনেছিল স্টীমার চালানোর জন্য। আবার প্যাসেঞ্জার বইতে হবে। কিন্তু এই যাত্রী বন্দুকধারী পাঞ্জাবী। তিন চার প্ল্যাটুন। মুসলীম লীগের দালালরা তার খোঁজ দিয়েছিল। নচেৎ সহকর্মী সহ এই ভাবে ধরা দেবার বান্দা সোলেমান সারেঙ নয়। ডেকের উপর সে নামাযের অক্তে দোয়া মাঙবার সময় সকলের কল্যাণপ্রার্থী রূপে আল্লার কাছে সেজদা দিয়েছে কত না দিন। কুলিয়ার চর থেকে ঘাটিতে বৈদেরবাজার এলাকায় এই সৈন্যদের বয়ে নিয়ে যাবে স্টীমার। কত অস্ত্র-শস্ত্র। ছোট ছোট কামান পর্যন্ত ডেকের উপর সাজানো। সোলেমান সারেঙ স্টীয়ারিং হুইলে হাত দিয়েছিল। এ আর এক মসিবত। কলকজা সবই ঠিক আছে। টিন্‌-টিন্‌ ডিজেল অয়েল মজুদ। কিছুই এই জলযানকে অনড় করতে পারবে না। সাদা দাড়ীর ভিতর আঙুল চালিয়ে চালিয়ে কত কি না ভেবেছিল, যখন স্টীমার ভেসে চলেছে মেঘনার স্রোত কেটে কেটে। পুরাতন সহকর্মীরা সবই আছে। স্টীমারও বর্তমান। কিন্তু কত তফাৎ আকাশ, মেঘ, নৌকা, পাখী! সব পূর্বের মত সবুজের ঘেরাটোপের মধ্যে চিরাচরিত ধারায় যেন স্বভাবকর্তব্য পালনে ব্যস্ত। সেও তার জীবিকা ফিরে পেয়েছে একমাস পরে। এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঘাটের পর ঘাট আসবে না। যাত্রীদের

হাঁক-ডাকের কথা অবান্তর। হুইসেল টানার প্রয়োজন নেই পর্যন্ত শুধু ইঞ্জিন ঘরের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ, সহকর্মীরা যে-যার কাজ ঠিক রেখে এক একবার সারেঙের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। আর ঘন ঘন সিগারেট বা বিড়ি ফোকার কথা কারো মনে উঠেনি।

পাশে পাঞ্জাবী সিপাইটা রেলিঙয়ে হেলান দিয়ে চারিদিকে তাকায়, সিগারেট টানে। একবার সারেঙের দিকে একটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাথা নেড়ে জানিয়েছে সে ধূমপায়ী নয়, মুখ খোলেনি অপর পক্ষে যে-কোন কারণে হোক, কথা বলতে চায়। ভাষা দেওয়াল। তা-ও সারেঙ ইশারায় জানিয়েছে।

—ও বইদ বাজার কিৎনা দূর ?

—দূর ?

সারেঙ এই শব্দ বোঝে, জবাব দিয়েছিল, তিরিশ মাইল।

—ত্রিশ কিয়া ? কিৎনা ?

—তিরিশ।

আরও কথা কি দিয়ে এগোবে ? আঙুলের সাহায্যে সংখ্যা গণনার একটা চেষ্টার পর সিপাইটা ক্ষান্ত দিয়েছিল। তারপর চুপচাপ। যে যার ডিউটি পালন করছিল নিজের মনে।

অনেক কথা মনে পড়ে বইকি। মেঘনার বিস্তার এখানে আকাশের কিনারায় থেমেছে মাত্র। দু'দিকে ছ'মাইল কি বোধ হয় আরও বেশী। ঘন ঘন বৃষ্টিপাতে চরগুলো সব ডুবে গেছে। তাই সমুদ্রের আভাস এখানে। সাদা গাঙচিল কেবল মাঝে মাঝে বিন্দুর মত দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায় নচেৎ শূন্যতাই এখানে সর্বেসর্বা। হঠাৎ গুলীর আওয়াজ শুরু হয়েছিল। এই আওয়াজের জন্যেই তো সারেঙ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আল্লার কাছে শোকর, বাংলাদেশে রাজারা প্রজাদের ভাষা বোঝে না। তাও আবার চট্টগ্রামী উপভাষাঃ জ্যাডা, তল্‌দি নল আছে যে ইবার মুখ খুলে দিবি। যানি ফডের অরধেক অইলে তোরা বেগগুনে ফানির মদ্দি ঝাঁফ দিস। জারগুয়ার ফোয়াইনে কি ফাইয়ে ? (জ্যাঠা, তলের নল-মুখ খুলে দিবি। পানি পাত্রের অর্ধেক হলে সকলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বি। ফড পট। পাত্র জাহাজ।)

ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালোফি করেছিল, যখন লাল হয়ে উঠেছিল পানির সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে। একসময় তলিয়ে যেতে হয় সমস্ত বারি-রাশির স্নেহের ভিতর, যখন নির্বাত হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগত। তারই মধ্যে ধরা দেওয়ার পূর্বে সোলেমান সারেঙের বুকে পরিতৃপ্তির ঘনঘটা, ঠোঁটে হাসির আচড় লেগেছিল বইকি : আর ঈষৎ সময়, থোড়া অক্ত। স্যুটবুট ধারী, এমনিতে ভারী প্রায় দেড়শ' বিদেশী শত্রু মেঘনার থাবার মুখে কুকুরের মত চীৎকার দিয়ে উঠবে অপমৃত্যুর অপচ্ছায়া দেখে।

নীলজল, স্বচ্ছ মেঘনা। খাকী রঙে বেঢপ করতে দেবে না তার বুকের বর্ণ-সমতল।

আর থোড়া অক্ত!

বার্তাবহ

সে ভেসে চলেছিল।

পঞ্চভূত এখনও তার সহায় হয়নি। শুধু বাতাস আর জলের সাথে সে এগিয়ে চলেছে। স্রোতের টান মৃদু। বাতাসের আমেজ ঝিরি-ঝিরি। বাইরের জগতে কোন তাড়াহুড়া নেই। আর যে ভাসছে, তার কাছে গতি এখন অর্থহীন। শ্লথ বা দ্রুত—কী আসে যায়। মহাকাল সামনে পড়ে আছে। বেসবুর হওয়ার প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। বুকে যখন বাতাস থাকে, তখন বাইরের বাতাসকে জমা খরচের হিসেবে আনা যায়। আজ সব হিসেব-নিকেশ আগামী ইতিহাসের কাছে তুলে দিয়ে সে পরম নিশ্চিন্ত।

সে ভেসে চলেছে।

সটান চিৎশায়িত। মুখ আকাশের দিকে। চোখ নেই। দাঁড় কাক দু'তিন দিন ধরে তা খুব্‌লে খুব্‌লে খেয়ে শেষ করেছে। কারণ, চোখের মালিকের কাছে চোখ থাকা বা না থাকা একই কথা। শুধু চোখ কেন? অনেক কিছুই নেই। গায়ের জামা খানিকটা গলার কাছে লেগে আছে। ডোরাদার কোন ছিট কাপড়। আস্ত আছে শুধু জুতা জোড়া দুই পায়ে। লেস টাইট করে বাঁধা। কাঁচা চামড়া সামনে থাকতে দাঁড় কাক ট্যান চামড়ায় কোন্ দুঃখে মুখ দেবে? বা তেমন মেহনতে পোষাবে না। কাকের মত চতুর প্রাণী তা আরো ভালো করে জানে।

হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়ি আছে কিন্তু শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। বাঁধন এখনও অটুট আছে। অবিশ্যি হাতের সব জায়গায় মাংস নেই। হয়ত নদীর মাছ অথবা কাক বা চিল বা শকুন ভাগ নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আগেই একটা শকুন বসেছিল তার কপালের উপর। কয়েকটা নৌকা আসতে দেখে আবার উড়ে গেছে। সে নিস্তব্ধ দেখে, আর কোন প্রাণী ভয় পায়না। তাই এত কাছে এসে জুলুম করে। কিন্তু জুলুম কেন ? অত্যাচারের সঙ্গে কষ্ট, যন্ত্রণা বেদনা আর্তনাদ কতো কী একজোট। এখানে তার কোন লেশ তুমি খুঁজে পাবেনা। সুতরাং কেউ জুলুম করছে বলা অন্যায়। প্রাণীরা আর কতটুকু জুলুমই বা করতে পারে ? এখানে বাঘ সিংহ বা হায়েনা কিছু নেই। নিরীহ কাক অথবা শকুন। কালে ভদ্রে নির্বাক কোন মাছ হয়ত এক খাবলা মাংসের লোভে নিকটে আসে।

ছোট উপনদী। খুব জোর তিন শ' গজ চওড়া। দুই তীরের মধ্যে নৈকট্য আছে। মাঝে মাঝে ঘন বসত পাড়ে। কোথাও কোথাও শুধু ফাঁকা মাঠ। কিন্তু কোন গ্রাম দু'মাইল দূর নয় নদীর কূল থেকে।

সে ভেসে চলেছিল।

দুই দামাল বালক দুপুরে নিজেদের গৃহপালিত প্রাণী গরু বা ছাগলের খোঁজে বেরিয়েছিল। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল তার ভাসমান শায়িত মূর্তি। একজন মাত্র অপরের চেয়ে বছর দুই বয়সে বড়। সেই সুবাদে মিয়া ভাই।

—দেখছ মিয়া ভাই।

—আরে কোন শরীফ লোক। মিলিটারী হালারা মারছে।

—মারে নাই। দড়ি-বান্ধা দ্যাহো না ?

—গুলি করছে না ?

—না। বাইন্দা পানির মদ্দে ছাইড়া দিছে।

—আহা !

—আহ !

দুই জনে গালে হতে দিয়ে বেবুঝ নির্বাকের মত নদীর ধারে বসে পড়েছিল। তাদের চোখ আর ভাসমান বস্তুর উপর নিবদ্ধ নেই। নদীর ওপারে বিরাট মাঠের ওধারে আর এক নদী আছে যদিও দেখা যায় না—বাদামের সারি থেকে প্রমাণ। তাদের চোখ এমনই কিছুর উপর অথবা দৃষ্টি শূন্যে ভাসছিল।

হঠাৎ বয়স্ক মিয়াভাই গ্রামের দিকে দৌড় মারলে। ছোট জন কিছু বুঝতে না পেরে বসে রইল। অন্য সময় হলে সে হঠাৎ অন্তর্ধানের হদিস বের করতো অন্তত কিছু একটা জিজ্ঞেস ছাড়া যেতে দিত না। আজ অনুজ নির্বাক নদীর ধারে দার্শনিকের মত চুপচাপ আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। যেন কোন কিছুই সে চোখে দেখছেনা। তা স্পষ্ট জানা গেল, যখন একবার দৃষ্টি মেলে সে মৃত জনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে আরম্ভ করলে। শবানুগমনের পয়লা সারির প্রথম জন।

সে এই ভাবে নিশিগ্রস্তের মত হেঁটে যেত। হঠাৎ পেছন থেকে তার নাম 'আলিম আলিম' চীৎকার শুনে সে ঘুরে না দেখলে। গ্রামের অন্তত পঞ্চাশ জন ছুটে এসেছে। দু'মিনিটে ভিড় জমে গেল। সকলে জানাজার শেষে শবানুগমন-রত।

মাঝে মাঝে মন্তব্য হল্কা তোলে।

—আচ্ছা, শুয়ারের বাচচারা প্রতিশোধ নেব বৈ কি।

—উহ্, কী জানোয়ারের কাণ্ড।

—ঢাকা বুড়িগঙ্গার উপর এমন বিশ তিরিশ জনকে একলগে বাইন্দা ভাসাইয়া দিছে।

—খান্‌কীর পুতেরা বাঙালীদের কী পাইছে ?

পাশাপাশি, লাগালাগি গ্রাম। মানুষ জুটছে এক এক করে নয়। দলে দলে।

তীরবর্তী এক ভিটা থেকে এক আধবয়সী মেয়ে উন্মাদিনী ছুটে এলো চীৎকার দিতে দিতে।

"আহারে পুৎ তোরে একবার দেইখ্যা লই।" আর দু'জন বুড়ী মেয়ে তাকে দুই হাত ধরে কী যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে।

নদীর ধারে এসে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। একবার তার চোখ পড়েছিল ভাসমান অনামা সেই ব্যক্তির দেহাবশেষের উপর। আর সে দিকে তাকায়নি সে। তার ছেলে ঢাকা শহর থেকে আর ফেরেনি। আর ফিরবে না। কিন্তু তার মৃত্যুর হদিস তার কাছে অজ্ঞাত।

মেয়েটিকে দুই বৃদ্ধা সঙ্গিনী আর এগোতে দেয়না। কাফেলা এগিয়ে যায়। নানা মন্তব্য ছোটে। হঠাৎ পাশের গ্রামের এক ভিটা থেকে

তিন জন টুপিধারী লোককে নামতে দেখে, জনৈক গ্রামবাসী চাপাস্বরে হুঁশিয়ারী ছাড়লে, "খান্‌কীর পুৎ মুসলিম লীগোরগুলো বারাইছে চুপ কইরা যাও।"

হঠাৎ স্তব্ধতা। যাদের আতঙ্কে স্তব্ধতা, তারা কি মনে করে নদীর উপর একবার চোখ ফেলে কৌতূহল মিটিয়ে আবার ভিটের উপর উঠে গেল।

সে ভেসে চলেছে।

দুটো গহনার নৌকার দাঁড়ি-মাঝি সামান্য দূরে হাল-বৈঠা ছেড়ে মাথা নীচু করে চুপ।

জানাজা শেষ হয়ে গেছে। খোয়াজ খিজির বা জলের দেবতা বরুণ—সাঙ্গোপাঙ্গ সহ কাঁধ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাট।

পিছু পিছু তারা হাঁটছে, যেন গোরস্থান পর্যন্ত এই ভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।

কাফেলা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

ঘাট থেকে মাঠ থেকে যে-যেখান থেকে পারে ছুটে আসছে। আব্রুভীতু গৃহবধূ এগিয়ে আসছে ঘোমটা টেনে গাছ গাছালীর আড়াল সম্বল করে।

নচেৎ যে-ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবাদ বয়ে এনেছে, তার জানাজায় শরীক না হলে যে সারা জীবন আফসোস থেকে যাবে।

জন্ম যদি তব বঙ্গে

দাঁড়াও, পথিকবর।

এই দেশে ত তোমার জন্ম। একবার দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও। তুমি ত সীমার নও। কারবালার যুদ্ধের পর ইমাম হোসেনের কাটা শির নিয়ে দামেস্ক নগরীর দিকে ধাইছ। হঠাৎ এসে পড়েছো। কেউ ত এদিকে আসে না। যখন এসে পড়েছ, একটু দাঁড়াও।

আমি জানি, কেন এমন বে-পথে তুমি এসেছ। বন-জঙ্গলের পথে কেউ হাঁটে না। কিন্তু বাঙলাদেশের মোহিনী মায়া সকলকে টেনে নিয়ে যায়। আর তোমার জন্ম ত এই বঙ্গে। তুমি বে-পথু হবে, তা আর আশ্চর্য কী?

কতো দরিদ্র আমাদের গ্রাম। কী আছে মানুষের সম্পদ? একটা খড়ো ঘর বা কুটির। এক চিলতে উঠান। হয়ত কয়েকটা কলাগাছ বা বাঁশগাছ বাস্তুর ধারে। দুর্নিবার দৌলত নেই। সেই অভাব মিটিয়ে যায় গাছপালা, বনবাদড়। আর মাঠের বিস্তার ত আকাশকে ডাক দিতে দিতে দৌড়ায়। বুকে নদীর ছলাৎছল কোথাও বেঁধে নেয়, যেখানে আকাশ-মুখী নৌকার লগী কখনও সচল কখনও অচল, যদি নৌকার সঙ্গে বাঁধা থাকে। অবসর পেলে তাই সকলেই দুষ্টু ছেলে সেজে বসে। হেঁটে হেঁটে দেখে, তখন পথ-বিপথ কেউ মানে না। গ্রামের বনবাদাড় জঙ্গল কেবল শেয়ালের প্রিয়। না, শেয়ালও ত বাঙলাদেশের শোভা, রাত্রির প্রহর ডেকে যায়। আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ তুলে যায়, যখন দুষ্টুমি করে কোন গেরস্থর মুর্গীহাঁসের উপর লোভ দেখায়।

তাই তুমি যখন পথ ছেড়ে মাঠের এই জংলা আবহাওয়ার দিকে পা বাড়িয়েছিলে, তখনই আমি বুঝেছি, জন্ম তোমার বঙ্গে।

সেই সুবাদেই তোমাকে ডাক দিয়েছি।

একটু দাঁড়াও।

আমিও এই দেশে জন্মেছিলাম। আমার আর কোন ঠিকুজী জেনে লাভ নেই কারো। তার দরকার নেই।

আমি বাঙলাদেশের অধিবাসী। এই দেমাক-ই একজনের পরিচয়ের জন্য কী যথেষ্ট নয়? বাড়ী কই, পেশা কী? এসব ত আমার কাছে অবান্তর মনে হয়। আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে বসে, হিন্দু না মুসলমান? তাও আমার কাছে অবান্তর। এই দেশে জন্মেছি, এ-ই কী আসল পরিচয় নয়?

একটু দাঁড়াও।

তুমি থমকে গিয়েছ। আমার ডাকে? না, বাঙলার সবুজ মায়ার হাতছানি তোমার চোখে যে আলতো স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে, তার আবেশে?

জানো, গাছপালার মর্মর সকলের কানে পশে না। এমন হতভাগ্য বহু আছে এই দেশে। এই মাটির সুগন্ধ অনেকের নাকে যায় না, এমন হতভাগ্য বহু আছে এই দেশে। তাদের আমি বড় করুণার চোখে দেখতাম। পরে ঘৃণা করতে শিখলাম, তুমুল ঘৃণা। কেন জানো? ওরা আর মানুষ থাকে না। তখন হিংস্র জন্তুর মত দপাদাপি করে বেড়ায়। জন্তুর মতই ওরা বোঝে না মা-বোনের ইজ্জতের মূল্য। গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায় আগুনে, হাজার হাজার মানুষের লাশ নদীপথে খড়কুটোর মত ভাসে, অসহায় অনাথ শিশুরা রাস্তায় রাস্তায় কাঁদে, শীতের দাপটে কুঁকড়ে কুকুরে মত আদমের সন্তান-সন্ততি হাত-পা সব বুকে গুটিয়ে পড়ে থাকে গাছতলায়, ক্ষেতে-খামারে। এমন শত শত দৃশ্য? না হাজার হাজার। না। লাখ লাখ দেশবাসীর বুকফেটে আহাজারী মহরমের মাতম বেরোয়। কিন্তু ঐসব মানুষ—না জন্তু, ওদের মনে কোন আঁচড় পড়ে না। কারণ, তার চোখে কোন দিন বাঙলার জলা-জাঙাল, গাছপালার মায়া ধরা পড়েনি।

আমি জানি, তুমি কেন থমকে দাঁড়িয়েছ। বাতাসের মর্মরের সঙ্গে যে আমার ডাক বাঁধা। তুমি শুনতে পেয়েছ বৈকি। তাই ত ডাক দিয়েছি: দাঁড়াও পথিকবর।

জন্ম যদি—৩

একশ' বছর আগে সাগরদাড়ী', না, বাঙলাদেশের বিদ্রোহী বজ্রকণ্ঠ কবি রেখে গিয়েছিলেন, নিজের কবর থেকে দেশবাসীদের অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে আহ্বানের অভিলাষ। আমি ত তারই মত দেমাকী, কারণ আমি বাঙলাদেশের অধিবাসী। তাই ত তোমাকে ডাক দিয়েছি। দাঁড়াও, পথিকবর।

আমিও কবরে শুয়ে আছি। না, কবর নয়। বরং বলব মাটির তলায় শুয়ে আছি। কারণ, কবর বললে অনেক কিছু বোঝায়। তা-ই না কী ? কবর মানে, লাশের গোসল, জানাজা, দাফন। কবর মানে, কাফনে ঢাকা মানব বা মানবীর দেহ। আমার এসব বালাই দরকার হয়নি। বাসিন্দা ছিলাম, ইসলামী রাষ্ট্রে, যাকে বলা হোত পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান। অন্তত আশা ছিল যেহেতু আমার বয়স সত্তরের বেশী, একদিন নাতি-পোতা ছেলেপুলেদের সামনে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। সকলে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে আমাকে গোরস্থানে নিয়ে যাবে—যে গোরস্থানে আমার পিতামাতা এবং সকল মুরুব্বীরা শেষ আশ্রয় পেয়েছে। বামনের চাঁদ হাতে পাওয়ার লোভ কা তা ? মোটেই না। ইসলামী রাষ্ট্রে অতটুকু ত আশা করা যায়।

কিন্তু আমার নসীবে তা জোটেনি। আমি মরলাম, কুকুরের মত। কোরান ছুঁয়ে কসম করতে পারি, তখনও পারতাম, আমি ত কারো ক্ষতি করিনি। লেখাপড়ার জন্যে কোনদিন মক্তবে যাইনি। অনেক বয়সে গাঁয়ের মানুষ মুরব্বী মনে করতে লাগল। তাই লজ্জা পেলাম। কিছু লেখাপড়া শেখা উচিত। তখন লুকিয়ে লুকিয়ে নাতিদের বই দিয়ে শুরু করলাম, ওদের কাছেই। অনেক দিনের আচোট মাটিতে ফসল দিলে যা হয়, আমারও তা-ই ঘটল। অনেক কিছু পড়ে ফেললাম। মাদ্রাসার পণ্ডিতের কাছে বই ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল—এমন কত কবি ও লেখকদের কাহিনী কবিতা পড়ে ফেললাম। আহা যদি জওয়ান কালে এসব শুরু করতাম। আফ্‌সোস হতো। জীবনে বিকেল নেমেছে। তার জন্যে দুঃখ করিনি। ছেলেরাও লেখাপড়া জানে না, আমার মত। নাতিরা লেখাপড়া শেখে, তবেই আমার বুক ভরে উঠবে। এই আশায় আশায় ছিলাম। জমিনের দেখাশোনা ছেলেরাই করত। এই ভাবেই ত জীবন কাটছিল।

হঠাৎ অনেক গুজব ভেসে এলো গাঁয়ে। মিলিটারী শকুনেরা ঢাকা শহর ভাগাড় মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এক রাত্রে হাজার হাজার

লোককে হত্যা করেছে, আগুন লাগিয়েছে শত শত ঘরে...। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু গাঁয়ে অনেকে যখন ফিরল না, ঘরে ঘরে কান্নাকাটি উঠল, আর স্থির থাকতে পারলাম না, ভাবতে চেষ্টা করেছি, কেন? কেন? এই বয়সে সব তলিয়ে বুঝে উঠতে পারি নি।

দুমাস গেল না, আমরা গাঁয়েই, জওয়ানেরা হঠাৎ খবর নিয়ে এলো: বাড়ীঘরদোর ছেড়ে পালান্ পালান্। মিলিটারী আইতাছে।

আমার চোখের সামনে সব ফাঁকা হয়ে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে। সবাই গাঁ ছেড়ে আরো দূরে যেতে লাগল নিরাপদ জায়গায় বাড়ীর সব কিছু ফেলে। আমার ছেলে, নাতি, ছেলের বৌ...সব। পাড়া প্রতিবেশী সবাই। আমি গোঁ ধরলাম। আমি বুড়ো মানুষ, কেন যাব? আমি ত কারো ক্ষতি করিনি, ভোট দিতে যেতে পারিনি পায়ে ব্যথা ছিল। আমি কেন কোথায় যাব?

তারপর তারা এলো, নেকড়ের পালের মত। গাঁয়ে ঢুকতেই কয়েকটা মেশিনগানের আওয়াজ করলে। কিন্তু আতঙ্কিত হবে কে? কেউ ত নেই। আমাকে উঠানে বসে থাকতে দেখে, ওরা একটু অবাক হলো। খাকী লেবাস একটা পাঞ্জাবী নেকড়ে আমার দিকে সঙীণ উঁচিয়ে বললে, "এই বুড্ঢা—"।

"স্লামালেকুম।"

শুনেছি ওরা মুসলমান, তাই স্লামালেকুম দিলাম। কোন জবাব না দিয়েই জিজ্ঞেস করলে, "এ-ই বুড্ঢা, ইদার মুকুত বাহিনী হ্যায়?" আমি হক্চকিয়ে গেলেও এতটুকু ভয় পাইনি। জবাব দিলাম, "মুক্তি ফউজ?"

—হাঁ, হাঁ। নেকড়েগুলো হাঁ-হাঁ করে উঠল।

—হাম জান্তা নেই। জবাব দিলাম।

এই বয়সে কেউ গাল দেবে জীবনে ভাবতে পারিনি। আমাকে অনেকগুলো গাল দিলে, বুট্ শুদ্ধ পা তুলে। কিন্তু লাথি মারলে না। মারলে বরং বুকে এত যন্ত্রণা হ'ত না।

আমার সালামের জবাব দেয়নি, তার উপর গালাগালি। আমাকে আবার জিজ্ঞেস করে, "মুকুত বাহিনী কিদার জান্তা?"

আমি তখন হাসতে লাগলাম বেশ হি-হি শব্দে। তিন চারটে নেক্ড়ে তখন আমার চারপাশে। বেশ অবাক হয়ে গেছে আমার হাসি দেখে।

—এই কিঁউ হাস্‌তা ? একজন বেশ রুক্ষ গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। আমার হাসি কিন্তু বেদম বেড়ে গেল। সত্যি আমাকে যেন ভূতে পেয়েছিল।

—এই কিঁউ হাসতা ? আমি একটু থেমে বললাম, "আল্লা তোম লোগকো আচ্ছা আকল দিয়া।"

আমার সাদা দাড়ী দেখে হয়ত কিছুটা খাতির করেছে। তা-ও হতে পারে। ওরা কিন্তু অস্ত্র হাতে বেশ অবাক দাঁড়িয়ে গেছে।

একজন বেসবুর, জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা আকল দিয়া।"

—হাঁ। আমার জবাব।

—কৈসে ? একটা পাঞ্জাবী নেক্‌ড়ে হালুম করে উঠল।

—কৈসে ? আমি পিঠে পিঠে প্রশ্ন করি।

হাঁ।

তখন বললাম, "কৈ সে ? তোম ত বাঙলা শিখ্‌নে লাগা হ্যায়।"

—বাঙলা শিখনে লাগা—অবাক হয়ে দলের একটা বিস্ময় প্রকাশ করলে।

—হাঁ। জবাব আমার।

—কৈসে ? আবার প্রশ্ন চালায়।

—মুকুত, বাহিনী—এসব বাঙলা শব্দ লফ্‌জ। তখন কয়েকজন বাড়ী লুট করছিল। আমি দেখেও দেখিনি। লাভ কী ওদিকে চোখ দিয়ে। যা করছে করুক।

একটা নেক্‌ড়ে তখন বেশ রাগত গলায় জিজ্ঞেস করে, "মুকুত বাহিনী বাঙলা লফ্‌জ তো হুয়া কিয়া ?"

মনে মনে বলি, "যদি অত বুঝবে, তা-হলে এখানে মরতে আসবে কেন ?" মুখ খুললাম জবাব দিতে, "ইয়ে বাংলা মুল্লুক সব শুষ লেতা, সব শুষে নেয়। তোম ভি বাঙলা শিখতা হ্যায়।"

বোধ হয় আমার রসিকতায় মজা পেয়েছিল বা হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, একটা নেকড়ে জিজ্ঞেস করলে, "হুয়া কিয়া ?"

শুরুয়া বা ঝোল খেতে অনেক সময় আমরা বেশী মজা পেলে যেমন হাপুস্ হাপুস্ শব্দ করি তেমনই শব্দ ঠোঁটে তুলে বললাম, "ওইসা শুষ লেতা।"

—তো হুয়া কিয়া ? আবার নেকড়ের হুঙ্কার।

—সব শুষ লেগা। ইয়ে জমিন, আসমান, মাটি, দরিয়া, নদী, হাওয়া --সব শুষ লেতা।

—কিয়া হাম্‌কো শুষ লেগা ?

—সব্‌কে। দেখা না বাঙলা শিখ্‌নে শুরু কর দিয়া।

নেকড়েগুলো তখন গর্জে উঠল না। একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলে, "মুকুত বাহিনী কিদার?"

—ন জানি। একদম গাঁয়ের ভাষা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

ওরা আর কিছু বললে না, শুধু ওদের সঙ্গে আমাকে যেতে বললে।

গায়ের বনবাদাড়ের এই পাশে ত কেউ আসে না। ওইখানে বর্ষায় মাটি ধ্বসে ধ্বসে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কিনারায় দাঁড় করিয়া ওরা আমার পেটে, বুকে সঙীন চালিয়ে দিলে, খোঁচার পর খোঁচা। তারপর যখন মাটি চাপা দেয়, তখনও ধড়ে জান্ ছিল।

একটু দাঁড়াও, পথিক। দেখছ না মাটির ভেতর থেকে আমার মুঠি বাঁধা হাত উঁচিয়ে আছে। মাত্র কব্জি পর্যন্ত। মাংস ত নেই। কাকের ঠোকরে শেষ। সাদা হাড়, মাটির রঙের সঙ্গে মিলে গেছে কারো চোখে পড়বে না সহজে। তুমি শুধু দেখে যাও। নেকড়ের পালে পড়ে আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে গেছি বাইরের জগতে। আমার মুঠি হাত, দ্যাখো, দ্যাখো।

তুমিও দুশমনকে আঘাত দিতে হাত মুঠিবদ্ধ করো। একটু দাঁড়াও। দেখে যাও, জন্ম যদি তব বঙ্গে। *

* স্বাধীন বাংলা বেতার হইতে ২০. ৯. ৭১ এ প্রচারিত।

রক্তচিহ্ন

একটিবার দৌড় দিতে পারতাম।

এই আফশোসটুকু বারবার নাজেমের মনে আঘাত করতে লাগল।

কিন্তু তা আর এ জন্মে সম্ভব নয়। ডান হাত এবং বাম উরুর দিকে তাকিয়ে নাজেম সিদ্ধান্ত আর একবার মৌরসী করে নিলে। নিজে ঘাড় দুলিয়ে সমর্থন জানাতে অস্ফুট উচ্চারণের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্ধকারে গুলি কী ভাবে তার উরুর উপর লাগল সে বুঝতে পারেনি। তবে কি সাবেক অভ্যেস অনুযায়ী সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল গুলি চালানোর সময়? "রাইফেল নিয়ে বুকে হামাগুড়ি সহযোগে সব সময় এগোনো বা পেছানো উচিত, যদি শত্রুর এলাকায় এসে পড়ো বা অপারেশান শুরু হয়ে যায়, কখনও দাঁড়াবে না বা হঠাৎ উঠে দৌড়ানোর চেষ্টা করবে না।" ক্যাপ্টেনের কথাগুলো সাঁইসাঁই নাজেমের কানে তরল সীসার মত ঢুকতে থাকে। কিন্তু আর কোন চারা নেই। হাত-পা—দু-ই জখম। দৌড়ানো আর সম্ভব নয়। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে মাত্র তিন হপ্তার ট্রেনীং। তা-ই কি অমন ভুল হয়ে গেল? অথবা প্রথম পাঞ্জাবী সৈন্য ফায়ারিং রেঞ্জে এসে পড়ায় তার হুঁশ ছিল না। যেহেতু প্রতিহিংসার তাগিদ পেছনে সেই কবে থেকে অঙ্কুশরূপে খাড়া আছে। প্ল্যাটুন কম্যাণ্ডার অর্ডার দিয়েছিল কখন? নাজেম আজ তা-ও ভাবতে পারলে না।

'এ্যাম্বুশ' করতে বেরিয়েছিল তারা আটজন। খান-সেনাদের গতিবিধি ক'দিন থেকেই তারা লক্ষ্য করেছে। আজ জালে ঠিক পড়ে গিয়েছিল দুশমন। তবু এমন হঠাৎ দুর্বিপাক কী করে তাদের ঘিরে ধরল, নাজেম আর ভাবতে পারে না। আর ভেবে লাভ নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই ঠিক করতে হবে। সেদিকে কোন ভুল হয়নি।

হাতের অস্ত্র খসে গিয়েছিল। বাম হাতে রাইফেলটা তুলে নিয়ে সে যথাসম্ভব কেবল হাতের কনুই আর এক পায়ের সাহায্যে, কখনও স্রেফ গড়াগড়ি দিয়ে নিজেকে বিপদ্‌মুক্ত করার চেষ্টা পেয়েছে। একসময় একটা ঝোপ দেখে রাইফেলটা গুঁজে দিয়েছিল। যদি সুসময় আসে, আবার বের করে নেয়া যাবে অথবা বন্ধুদের হদিস দিয়ে যেতে ভুল হবে না তার। মৃত্যুর কথা একবার চকিতে তার মনের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল বৈকি! কিন্তু সহজে দমে যায়নি সে। তার দলের সঙ্গীরা কোথায়? তারা কী যুদ্ধের ময়দানে শহীদ অথবা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সহজে কোথাও ওৎ পেতে সরে গেছে?

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল নাজেমের। চাষীর সন্তান সে, মেহনতের পরোয়া রাখে না। ছেলেবেলা থেকে খুঁটে খেতে শিখতে হয়। ধকল, সওয়া যেন জন্মগত অভ্যেস। আর কেউ হোলে এতদূর আসতে পারত না অমন জখম শরীর নিয়ে। কালো কুচকুচে! নানা ঝড়-ঝাপ্টা সয়েও যৌবনের হাওয়ায় কি তরতরে চেহারা। এখন কাল্‌সিটে দাগ পড়ে গেছে মুখে।

তখনও রক্ত ঝরছিল ক্ষতস্থান থেকে। তবে পূর্বের মত ফিক্‌ ধরে নয় এবার ফোঁটায় ফোঁটায়। কিন্তু রক্ত পড়ার কামাই নেই। প্রথমে নিজেই চেপে ধরেছিল সে বাম হাত দিয়ে জায়গাটা। ওদিকে পায়ে আর এক উৎস। তখনই আবার সেই জায়গায় খবরদারি। একবার হাত, একবার পা। রক্তের তোড় কমিয়ে দিয়েছিল নাজেম, কিন্তু একদম বন্ধ করতে পারেনি। এক রকমের অবসন্নতা ঘিরে ধরছিল। কিন্তু মনের বল হারায়নি নাজেম। ঘষ্‌টে-ঘষ্‌টে গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছিল সে।

ফিকে জোছ্‌নায় চারিদিক আব্‌ছা। এমনই মৌকা খুঁজেছিল তারা। শত্রুর গতিবিধি দেখতে ভুল হবে না। কোন ভুল হয়নি। তবু হঠাৎ ওলটপালট হয়ে গেল। হয়ত রাজাকাররা গোয়েন্দাগিরি করেছে। অথবা আর কিছু।

রক্ত ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে ওঠে। তখন আরো পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই একসময় নাজেমের মনে হয়, এইভাবে আর বেশীদূরে এগোনো যাবে না। লড়ায়ের নেশার কোন্‌ দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সে, তখন জানার বাইরে। জায়গাটা অচেনা ঠেকতে লাগল। তবু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। খান সেনারা তখনও এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে

যাচ্ছে। বাংলার স্তব্ধ গ্রামের পাঁজর ছেদ করে-করে শব্দ ভেসে যাচ্ছে। মাইল দুই দূরে একটা বিল আছে। বহু পাখী সারা বছর সেখানে গুলতানি করে দিনরাত ধরে। সেদিন সব নিঝ্ঝুম। শুধু গুলির শব্দ একমাত্র সজীবতা। একবার যন্ত্রণার চোটে নাজেমের মনে হয়েছিল সে চীৎকার দিয়ে উঠবে। কিন্তু দাঁত দিয়ে ঠোঁট এমন চেপে ধরেছিল যে, কেটে খসে যাওয়ার উপক্রম। তাহলে রক্ত-ঝরার আর একটা নালা সৃষ্টি হোত। জমিনে নিজের মুখ গুঁজে ধরেছিল নাজেম। বাংলার মাটি তার দুর্বা ঘাস বিছিয়ে রেখেছিল সেইখানে। তাই কোন কষ্ট পায়নি নাজেম। আশ্চর্য এক সুবাস কচি দুর্বার। কেমন যেন তেজ ফিরে পেয়েছিল নাজেম আরো নিজেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার। নিজেই ত সে বোঝা এবং বাহক।

এলোপাতাড়ি গুলির আওয়াজ চলছে থেকে থেকে। কিন্তু নাজেম স্থির নেই। এগোচ্ছে এক হাত এবং পা সম্বল করে যতদূর এবং যত তাড়াতাড়ি সরে পড়া যায়। গন্তব্য সে ঠিক করে নিয়েছিল বৈকি। এক কাজ সে করতে পারত। হয়ত বেঁচে যেত বা বাঁচার একটা উপায় হোতে পারত তখন। কিন্তু সব কাজই এখানে সময়ের উপর নির্ভর। দেরী করলে চলবে না। পাঞ্জাবী সৈন্যরা তাদের অবস্থান হদিস পেয়ে গেছে। কসুর করবে না তারা একটা বন্দী অন্তত হাতে পেয়ে। তারপর ধোলাই দিয়ে বের করবে আরো খবর, আরো গতিবিধি, আরো মানুষের চলাফেরার এলাকার শুলুক। ওদের হাতে অস্ত্র বেশী, লোকসংখ্যা বেশী। এখনই হয়ত আরো রিলিফের জন্যে বেতার মারফত নিকটস্থ ফাঁড়িতে সংবাদ পেঁৗছে দিয়েছে। বড় চকিত, দ্রুত —নাজেমের মনে এসব চিন্তা খেলে যাচ্ছিল। তাই দ্রুত এগোচ্ছিল সে নিজের গন্তব্য পথে। ওদিকে দমে কুলায় না। বড় হাঁপাচ্ছিল সে। তখন একটু থামতে হয় বৈকি। কিন্তু তা-ও যেন এক পলক। সামান্য বিশ্রাম। তা-ই যেন যথেষ্ট। তারপর মনের সঙ্গে দেহের লড়াই শুরু। না, দেহ কোথায়? মনই যেন ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিস্তার দিচ্ছে না। যখন নিস্তার আসে তা-ও যেন মনেরই হুকুম। শত্রুর সব ষড়যন্ত্র তাকে ভণ্ডুল করে দিতে হবে।

সব চিন্তা দূরে চলে গেছে। একমাত্র চিন্তা, নিকটে থেকো না। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে নাজেম? তার হিসেব সে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি।

নাড়া-ভরা ক্ষেত, আচোট অথবা কর্ষিত মাটি, ঝোপ-ঝাপ, কন্টিকারী কাঁটার জমিন-সংলগ্ন বন, কোথাও একটা কি দুটো গাছের আড়াল। সব পার হয়ে আসছে নাজেম। কিন্তু খেয়াল নেই কিসের উপর দিয়ে পার হচ্ছে। স্থান এবং সময় এখানে বড় কথা। আর কিছু বাছ-বিচার করার সময় নেই, যেমন একস্থানে বসে থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

হঠাৎ অনেকক্ষণ সব স্তব্ধ।

নাজেমের কান খাড়া ছিল। সে বুঝতে পারলে ঠিকই। কিন্তু তা কোন সাহস যোগায় না। সে জানে, নিজের শত্রুরূপে সে যতক্ষণ মাটির উপর আছে, পাঞ্জাবী সিপাইরা উল্লসিত হয়ে উঠবে। একটা পানাভরা বিল কাছাকাছি থাকত, তাহলে অনেক সহজ হয়ে উঠত সিদ্ধান্ত। অগাধ পানির মধ্যে জানোয়ারগুলো তাকে হয়ত খুঁজে পেলেও কিছু করতে পারত না।

......জয় বাংলা।

বুকের ভেতর থেকে শব্দটা চাড়া দিয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কিছু বেরোতে পারে না। দাঁতে ঠোঁট চেপে নাজেম তার শেষ শক্তি দিয়ে হামা-গুড়ি-যোগে বাড়িয়ে তুলছে শত্রু এবং তার মধ্যে ব্যবধান। ভাগ্য ভাল, মালকোঁচা-মারা লুঙ্গিটা খুলে যায়নি। হয়ত উলঙ্গ তাকে ওই ভাবে এগোতে হোত। তখন উঁচুনীচু জমিন আদৌ সাহায্য করত না। কাঁটা ঝোপের মুখে আরো রক্ত দিতে হোত—যার অভাব পলকে পলকে প্রকট।

সামনে পড়ল একটা খেজুর গাছ। সামান্য ঝোপ-ঝাপ আশপাশে। চাঁদের আবছা আলোয় বেশ দেখা যায়।

নাজেম ভাবলে, এবার একটা হিসেব-নিকেশ নেয়া যেতে পারে। খামখা অনেক দূর গিয়ে আবার নতুন বিপদ সৃষ্টি করে লাভ কি? এলাকা মোটামুটি জানা। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। আর যে-ভাবে সে এগিয়েছে, নিশ্চয় এক দেড় মাইলের বেশী পার হয়ে এসেছে। এখন আর এক সমস্যা আছে। দিক ভুল করে বসেনি ত সে? ওদিকে দম শেষ হয়ে আসছে। এই ভাবে আর বেশীক্ষণ চলা সম্ভব নয়। ডান হাতের দিকে বুকের কাছে বেদনা এমন মোচড় দিয়ে উঠছে যে কোথাও বিশ্রাম নিতে হয়। এবং এই বিশ্রাম দু' চার মিনিটে শেষ করলে চলবে না। অনেক, অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে।

খেজুর গাছের কাছে এসে সামান্য আশ্বস্ত হয় নাজেম। এতক্ষণ চারদিকে চেয়ে দেখার সুযোগ পায়নি সে। কারণ, আশপাশ জরীপ করতে গেলে মাথা অনেকখানি উঁচু করে তুলে দেখতে হয়। তার সুযোগ ছিল না। শত্রুর তাক্ সহজ হয়ে পড়ে তেমন ক্ষেত্রে।

পেছনে আর কোন শব্দ নেই। খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসতে চাইলে নাজেম। তখন প্রয়োজন হলে, কোন রকমে গাছের সঙ্গে সমান্তরাল এক হাত ও পায়ের সাহায্যে সে জায়গাটা জরীপ করে ফেলবে। সেইভাবে সে তার কাজের বহর ভাসালে। ঝিরিঝিরি বাতাস বয়ে গেল এই সময়। খেজুর গাছের ডালে শন্‌শন্ শব্দ হয়। নাজেমের গায়ে একটা চার পকেটওয়ালা খাকী হাওয়াই শার্ট। ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। এখন কয়েকটা বোতাম খুলে দিলে নাজেম। শরীরে যেন অনেক তাগদ ফিরে এলো। কিন্তু এখানে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম করা সঙ্গত কিনা, দেখে নেওয়া উচিত। তিয়াসে ছাতি শুকিয়ে আছে ক্রমশ। নাজেম তা ধর্তব্যের মধ্যে আনলে না।

এক হাত এবং পায়ের সাহায্যে অতি কষ্টে খেজুর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে সে খাড়া হোলো। চারিদিকে একবার দেখে নিতে হয়—যেখানে বাংলাদেশের গাছপালা, কুটির, গেরস্থর ঘরদোর সব দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ত মাটি আশ্রয়। হয়ত আর কিছুই দেখা হবে না।

খেজুর গাছের উঁচুনীচু গা অনেক খানি সাহায্য করলে। বাকলের খোপে খোপে আঙ্গুল দিয়ে খাড়া হওয়া যায়—যা অন্য গাছে সম্ভব হোত না। ক্রমশ স্তিমিত শরীর এবং চোখের দৃষ্টি। সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে ক্রমশ। তবু নাজেম তাকিয়ে নিলে দিকদিগন্তের দিকে। একটা বড় মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে সে।

বেশীক্ষণ ত দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। শরীরের কলকব্জা নীচের দিকে টান দিচ্ছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে না আছাড় খেয়ে পড়ে সে। তাই আবার গাছের অঙ্গ ধরেই ধীরে ধীরে গোড়ায় পেঁছানো। কোন রকমে বসে পড়ল নাজেম। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইল। সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ধীরে ধীরে। কারণ নিঃশ্বাসও এখন আর সহজে বেরোয় না।

সোয়াস্তি বৈকি। আর কোন আফসোস নেই নাজেমের। মুক্তি-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল সে, নিজে বেঁচে থাকার জন্য নয়, দেশের আর সব মানুষকে বাঁচাতে। তাই কোন অনুতাপ নেই বুকে।

আশপাশে অন্তত দু-মাইল শুধু বেবহা মাঠ। কোন লোকালয় আশেপাশে নেই। চেনা জায়গা। বেশী ভুল হওয়ার কথা নয় নাজেমের। আর সেই জন্যেই ত এত তক্‌লীফ বুকে সয়ে নিয়েছিল।

বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সে চোখ বুঁজলে। বড় পরিতৃপ্তি! সে এমন ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে কোন লোকালয়ে পৌঁছতে পারত, তখন হয়ত চিকিৎসার উপায় হোত, যার ফলে, জীবনের আশা একদম থাকত না—এমন বলা চলে না।

কিন্তু নাজেমের কাছে তেমন কাজ অসম্ভব।

মনে পড়ল, তার গ্রামের কথা। সব ছায়ার মত ভেসে আসে। বাবা এখন হয়ত সারাদিনের খাটুনির পর মা'র সঙ্গে তার কথা ইয়াদ করছে। নিশুত গাঁয়ে শেয়ালের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে কোন কোন গের-স্থর। কোথাও ছোট কচি বাচচা কাঁদছে। নদীতে এসেছে জোয়ার। গাঁয়ের রাস্তাগুলো শুক্‌নো খটখটে এখন জোছ্‌না পোহাচ্ছে। দুই জেলা পার হয়ে এসেছে সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। কুমিল্লার এই সীমান্ত থেকে বহু ক্রোশ দূরে ছোট পাড়া-গাঁ বার বার চোখের সামনে হাতছানি দিতে লাগল। বাপের অশ্রুসজল কণ্ঠ ভেসে আসে, "আল্লার রাহে সঁপে দিলাম, সহি-সালামতে থাইক্যো বা-জান।"...

আর কোন গাঁয়ের দিকে নাজেম যেতে পারত বৈকি। সে এসেছিল মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে। গ্রাম এত দরিদ্র। শোষণে শোষণে নিতান্ত শ্রীহীন। এসেছিল ভাইয়ের বেশে পাঞ্জাবীরা। তারাই শোষক সেজে বসল। তাদেরই মোকাবিলা তাই প্রথমে দরকার। গ্রাম জেগে উঠুক, গ্রামের মানুষের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসুক। আসুক অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, মায়া-মহব্বৎ...সবই পুড়ে গেছে দারিদ্র্যের আগুনে। সেই আগুন নিভাতেই ত নাজেম ঘরছাড়া হয়েছিল, নিজের গ্রামছাড়া হয়েছিল। সে ত গ্রাম গড়ে তুলতে চায়...ধ্বংস করার জন্যে তার জন্ম হয়নি।...

তাই ত নাজেম ওইখানে বসে আছে, গাছের গুঁড়িতে ঠেস। চোখে আবছা নানা স্বপ্ন। বেবহা প্রান্তরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। আশপাশে কোন গ্রামের দিকে যায়নি সে, যদিও যেতে পারত।

আহত মুক্তিযোদ্ধা নাজেম। বাংলা জননীর বীর সন্তান। স্বেচ্ছায় কোন গ্রামের দিকে সে কেন যাবে?

রক্ত ঝরছে তার শরীর থেকে। রক্তের দাগ ত মুছতে পারবে না সে। এইখানে তার মাথা পরিষ্কার ছিল।

রক্তের দাগ ধরে ডালকুত্তা শিকার খুঁজে বের করে। দুর্ভাগ্য আজ সে শিকার। ডালকুত্তারা তার হদিসে এগিয়ে আসবে না—তা হয় না। এই ডালকুত্তারা আবার মানুষ। কুকুরের চেয়ে হিংস্র এবং আক্কেল ঢের বেশী। তাই আরো ভয়। রক্তের দাগ ধরে ধরে কোন গ্রামে পৌঁছলে ওই পাঞ্জাবী জানোয়ারেরা সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে...আরো কতো মানুষ...অসহায় নারী...প্রাণভয়ে আর্তনাদ করছে, দৌড়াচ্ছে, দাউ দাউ জ্বলছে গ্রাম। আমার মৃত্যুর আরো শত শত মৃত্যুর কারণ হোক..না...না। চীৎকার দিয়ে উঠত বৈকি নাজেম। কিন্তু গলা তখন আর সাহায্য করে না।

অন্য চীৎকার এবং ফাশ্‌লাইটের আলো একই সঙ্গে ধেয়ে এলো তার চারপাশ ঘিরে। তখনও সে খেজুর গাছের আড়ালে। ধীরে ধীরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নাজেম।

নিশ্চিত মৃত্যু সম্মুখে। আজরাইলদের হাঁকডাক কানে স্পষ্ট পৌঁছায় খুব জোর পাঁচ শ' গজ দূর থেকে। বেশী দেরী লাগবে না শিকার খুঁজে পেতে।

"শালা বাঙালী কা বাচচা ইদির আয়।"

"যায়েগা কিদার হারামজাদা।"

"টর্চ ঠিক-সে ফেলো-জী।"

"গনী খান কা দাদ (প্রতিশোধ) লেনা হ্যায়।"

"ওই শালা দারাখ্ত কা নীচে পড়া হুয়া।"

"জেন্দা নেহি। এৎনা খুন বহা।"

"তভি হুঁশিয়ার।"

ডালকুত্তাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। টর্চের তীব্র আলো নাজেমের শরীরে পড়ল, তা বুঝতে দেরী হয় না, তবু আর কোন ভয় নেই তার।

উবুড় হয়ে শুয়ে আছে সে। মাটির সন্তান মাটির বুকে বুক মিলাতে পারলে, দেহের, মনের তাগদ ঢের বেড়ে যায়।

উবুড় হয়ে শুয়ে আছে নাজেম যেন মৃত। কিন্তু ঝোলানো হাত-বোমাটা সে অতি কষ্টে রক্ষা করেছিল বুক-পকেটে সযত্নে রেখে, হাজার ঝুঁকি যদিও। সে-টা বাম হাতের মুষ্টির মধ্যে ঠিক আছে। দাঁত দিয়ে পিন্ খুলতে কোন কষ্ট নেই। "আসুক, খান্‌কীর পুতেরা আরো কাছে আসুক। ওই সময় পর্যন্ত যেন আমার দম-টুকু থাকে, হে আল্লা মাবুদ.।

ফাঁকা মাঠ। ফ্লাশ-লাইটে দিনের মত, দেখতে কিছু অসুবিধা নেই। খেজুর গাছটা বেড় দিয়ে একটু পরে এগোতে লাগল পাঞ্জাবী সৈন্যরা।

আর একটু পরে একটা হাতবোমা ফাটল কিছু মানুষের মিলিত আর্তনাদ-সহ।

দুই ব্রিগেডিয়ার

পাটের গুদামে আগুন লেগেছিল। বিরাট টিনের শেডের নীচে হাজার হাজার গাঁট স্তূপ। কিভাবে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়, তা কেউ বলতে পারবে না। চারিদিকে আগুনের লকলকে জিভ যখন সব চেটে-পুটে ছাই করে দিতে বেরিয়ে আসছিল, তখনই খবর পাওয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেডে খবর পৌঁছতে বেশী দেরী হয়নি।

দমকল বাহিনী লড়ায়ে নেমে পড়েছিল যেন শত্রুপক্ষ আর এগুতে না পারে। কাছেই নদী। সুতরাং গোলাবারুদের অভাব হয়নি। হোস পাই-পের ভেতর দিয়ে পানির ফোয়ারা কামানের গোলার মত ছিটিয়ে পড়ছিল।

কিন্তু এই শত্রু তো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। তাই ফায়ার ব্রিগেডের সৈন্যসামন্তরা স্থির করেছিল গুদামের চালের একদিক খুলে উপর থেকে পানি মারার বন্দোবস্তই যুক্তিযুক্ত।

কয়েকজন ফায়ারম্যান সিঁড়িযোগে চালে উঠে দমাদ্দম নাটবল্টু খুলে টিন টেনে আলগা করতে লাগল। কেউ কেউ ভেতরে হোস পাইপ ঢুকিয়ে পানি মারতে শুরু করলো।

কিন্তু আগুনের গোস্সা যেন সেদিন আর থামতে চায়নি। চালের ক্রমশ তেতে ওঠা টিনগুলো পর্যন্ত আগুনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। রাগ কি কম। ফটফট শব্দে চাল-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। কোথাও কোথাও নীচে কাঠের আড়া পুড়ে বা ঝলসে গেছে। সুতরাং টিন আর নিজের জায়গায় থাকতে চাইবে কেন?

এই ক্ষেত্রে যে-সব ফায়ারম্যান চালের উপরে উঠেছে তাদের সমূহ বিপদ। কয়েকজন ফায়ারম্যান আগুনের তাপ আর ধোঁয়ার মধ্যে তখন যেন সিলুয়েট ছবি অথবা নড়াচড়া-রত প্রেতের দল।

গাঁটের ভেতর হয়ত কিছু ভিজে পাট ছিল। ফলে, ধোঁয়া উঠতে লাগল রাশরাশ। সব কুণ্ডলী পাকানো অজগর। ফুঁসে উঠেনি, পাঁয়তারা করছে।

কিন্তু সাবাস, অগ্নিসৈনিকের দল। অফিসারের আদেশ পালন করছে বটে। কেউ একচুল এদিক ওদিক নড়ছে না। অবিশ্যি পরিস্থিতি বিষম। ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আগুন এবং পানিতে যেন বক্সিং লড়ছে অথবা কুস্তি। মাঝে মাঝে একে অপরের কোমর জাপটে পাছড়া-পাছাড়ি শুরু করে দিয়েছে।

কট-ট-ট...

শব্দ হচ্ছে নাট-বল্টু খুলে যাওয়ার। শব্দ শুধু হিসহিস হোস পাইপের শীষ ধ্বনি।

মানুষের দিক স্তব্ধ। দাঁতে দাঁত কামড়ে তারা দুশমনের মোকাবিলা-রত।

হঠাৎ সেই দোজখের কড়ার ধোঁয়া এবং আগুনের ঝলকের মধ্যে থেকে যেন গায়েবী আওয়াজের মত নির্দেশ হেঁকে উঠল, "ফায়ার মেন, গেট ডাউন—নেমে পড়ো, নেমে পড়ো।"

একজন অফিসারও টিনের চালে উঠেছিলেন দুশমনের গতিবিধি দেখে অপারেশনের লাইন ঠিক করতে। বোঝা গেল, রণ-কৌশল বদলাতে হবে।

নীচে আরো দু'জন জুনিয়র অফিসার ছিল। সিনিয়র চালের উপর। হুকুম তিনিই দিচ্ছেন।

কিন্তু যিনি গায়েবী আওয়াজ ছাড়লেন, তিনি কোথায়? "ফায়ারম্যান, গেট ডাউন।" শব্দ বেরুল। শব্দের উৎস কোথায়? তা আর দেখা যায় না।

ধোঁয়ার পুরু ঘন কুণ্ডলীর মধ্যে চোখের কোন দাম থাকে না। শব্দের উৎস কোথায়?

নীচে আগুনের মোকাবিলা চলছিল। আগেকার কায়দা অনুযায়ী।

কিন্তু সমস্ত ফায়ারম্যান জুনিয়র অফিসার সমেত তখন হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিয়েছিল, "ভুঁইয়া সাহেব কোথায় ? কোথায় ভুঁইয়া সাহেব"" ????।

দুই জুনিয়র অফিসার রীতিমত আর্তনাদ চীৎকার দিতে লাগল, "ভুঁইয়া সাহেব, ভুঁইয়া সাহেব।"

কোন সাড়া মেলে না।

একদিকে দুটো টিন ছিটকে পড়ল।

সমস্ত গুদামের চেয়ে তখন একটি মানুষের কথা বড় হয়ে দেখা দিল। যত লাখ টাকার পাটই থাক, তা একটা মানুষের প্রাণের মূল্যের তুলনায় কিছুই না।

গুদামের নীচে আগুনের কুণ্ডের মধ্যে পড়ে যায়নি ত অফিসার ভুঁইয়া সাহেব ?

উদ্বেগ-মথিত চীৎকার চতুর্দিকে, 'ভুঁইয়া সাহেব, মিষ্টার……।'

শোরগোলে স্পন্দিত চতুর্দিক।

গুদামের প্রায় দশ বারো ফিট দূরে ছিল একটা দোতালা টিনের বাড়ী। সেদিকে আগুন ধায়নি। কিন্তু সব ধোঁয়ার তলায় চাপা।

হঠাৎ দোতালার বাড়ীর টিনের চালে ধপ ধপ শব্দ উঠল। যেন একটা বানর লাফিয়ে পড়ল।

আগুনের হামলা নেই এইদিকে।

খাড়া চাল। উপরে কেবল নাট-বল্টু কিছুটা আঙুল দিয়ে ধরা যেতে পারে। নচেৎ সবই সমতল। আর আছে ঢেউটিনের খাঁজ। কিন্তু তা আড়াআড়ি নয় লম্বালম্বি। সুতরাং ধরবার জন্যে আর কী সুবিধা পাওয়া যাবে ?

হয়ত বানর লাফিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এই বানর সব বানরকে হার মানায়। সেই বানর টিনের চালে লাফিয়ে পড়ে ; ছোট ছোট নাট-বল্টুর ঠেক্‌টুকু আশ্চর্য নিজের ক্ষিপ্র আঙ্গুলে এমন মানিয়ে নিয়েছিল যে গোটা দেহের ওজনে সড় সড় নীচে পড়ে হাত পা ভাঙ্গার জায়গায় হেঁচড়ে-হেঁচড়ে শেষে জমিনের উপর পা রাখল না শুধু, কয়েক পা দ্রুত দৌড় মেরে তারপর থামলে।

"একী করেছিলেন, ভূঁইয়া সাহেব ?

ভূঁইয়া সাহেব।

অস্বোয়াস্তি বুক থেকে নামাতে ব্যস্ত প্রশ্নকারীদের মজকুর বানর জবাব দিয়েছিল, "ডিউটি ইজ ডিউটি······কর্তব্য কর্তব্যই।"

তখনই আর কোন কথা না বলে নিজে হোস পাইপ হাতে নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সয়ীদুর রহমান ভূঁইয়া দুশমনের মোকাবিলা করতে।

এমন কাণ্ড বহুবার ঘটেছে অফিসার ভূঁইয়ার পেশাগত জীবনে। আগুন আর বিপদের সন্মুখে সে আর এক মূর্তিতে পরিণত হোত। ফায়ার বিগ্রেডের লোক, বন্ধুরা ঠাট্টা করে ডাকত, মিষ্টার ব্রিগেডিয়ার। মোদ্দা কথা, ভূঁইয়া যেন আগুন দেখলেই জান-কবুল করে বসত। আর একবার অল্পের জন্যে সে বেঁচে গিয়েছিল এক পাড়ায় আগুন নেভাতে গিয়ে। কাহিনী ত একটা নয়। বহু ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই।

সয়ীদ ভূঁইয়া বলত, "শোনো, আগুন ত আগুন নয়, মানুষের সর্বনাশ। কতো কী করে একটা লোক কিছু গড়ে' কতো বছরের মেহনৎ লেগে যায় একটা কারখানা বানাতে। অথচ হারামী আগুন পাঁচ মিনিটে দিলে শেষ করে। কারখানা কি, বাড়ী ত ইট-কাঠ-সিমেণ্ট। কিন্তু মানুষ থাকতে পারে তার ভেতর। মানুষের জানের দাম কী টাকায় মাপা যায় ? তাছাড়া—।"

এই সময় হয়ত আপনি নোক্তা দেবেন, "তাছাড়া আর কী, ভূঁইয়া সাহেব ?'

সে তখন তার ছিপছিপে কালো টাইট গতরখানা একটু বাঁকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে সামান্য টান মেরে জবাব দেবে, "শোনেন, ডিউটি ইজ ডিউটি... ...কর্তব্যই কর্তব্য। ধরুন এই পাট গুদামের কথা। আমরা পাট দিয়ে... ...বিনিময়ে বিদেশী জিনিস কিনি, যা আমাদের দেশে তৈরী হয় না—যেমন, ওষুধপত্র, রেলগাড়ীর নানা সরঞ্জাম, লঞ্চ-স্টীমারের কলকব্জা অগয়রা-অগয়রা কটা জিনিস আর এদেশে তৈরী হয় ? এসব জিনিস বিদেশ থেকে না এলে গোটা দেশ কানা। এখন বলুন আগুন মানে কী ? আর আমি ত ফায়ার সার্ভিসের লোক—আমার কোন কর্তব্য নেই ? তবে মাস মাস বেতন নিই কেন ?"

জন্ম যদি—৪

সয়ীদ ভূঁইয়ার কণ্ঠস্বর এই সময় চড়ে যেত অজানিতে। তখনই আবার খাদে নামত।

নিজের প্রাণের দাম আছে। বন্ধুবান্ধব হিতাকাঙক্ষীরা তা দেখিয়ে দিলে সে জবাব দিত একদম পিতৃদেবের দোহাই মেরে, "আমি, হ্যা আমার বাবা মরহুম আব্দুল মজিদ ভূঁইয়া বলতেন, 'বা-জান, মানুষের বিপদ-আপদ দুঃখু দেইখলে নিজের মসিবৎ মনে কইরো। মানুষ হওনের ওই একটাই সিধা রাস্তা আছে, আর নাই। এ কথা হরগিজ কখ্খনও ভূইলো না।"

হয়ত পিতার বাণী অথবা মূতি সয়ীদ ভূঁইয়াকে অমন সাহস যোগাত মসিবতের সামনে, বিপদের দরিয়ায়। অতি সংক্ষেপে, এই হচ্ছে সয়ীদ ভূঁইয়া, বন্ধুজনের কাছে ব্রিগেডিয়ার।

একদিন ভূমিকম্পের মত হঠাৎ এসে পড়ল।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সন।

এই দিনের বা রাত্রির কী কোন ব্যখা দরকার আছে, বাংলাদেশের অধিবাসী বলে দাবী করে এমন কারো কাছে?

সয়ীদ ভূঁইয়া সারা দিনের কাজ ও উত্তেজনার পর নিজের বাড়ী ফিরেছিল। যথারীতি সেরেছিল রাতের আহার। তার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল রাত দশটার মধ্যেই। সাধারণত এমন হয় না। সারা দিনের ক্লান্তির জন্যেই হয়ত অমন সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঢাকা শহর কেয়ামতের ভূমিকার শব্দে সেই রাত্রে চমকে উঠেছিল বার বার।

শেল-মর্টার ... ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ চতুদিকে।

সয়ীদ ভূঁইয়া ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এলো তখনই। সঙ্গে আতঙ্কিতা স্ত্রী।

সয়ীদ ভূঁইয়া এদিক ওদিক তাকালে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল শহরের দক্ষিণ দিকে দাউদাউ লাল আগুনে এবং ধোঁয়ায় কুন্ডলী। তার এলাকা থেকে বেশ দেখা যায়।

ভূঁইয়া চট করে তার স্ত্রী ও অন্যান্যদের নিরপত্তার নির্দেশ দিয়ে নিজে চটপট তার হাফপ্যান্ট আর খাকী শার্ট পরে বেরিয়ে এলো। স্ত্রী বারণ করল না। কারণ, সে জানে, নিষেধের কোন মানে নেই অমন ক্ষেত্রে।

গ্যারেজ থেকে নিজের জীপ ষ্টার্ট দিয়ে সেই রাত্রি তাড়াতাড়ি পৌঁচেছিল নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে। সবই চট পট ঘটছে। ও দিকে মারণাস্ত্রের বিচিত্র শব্দ উঠছে। বুম...শ...ট...ট ...।

অফিসার নিজে স্টেশনে। দমকল বাহিনীর লোকের এমনিতে তৈরী থাকে। তারা গাড়ী বের করে ছুটিয়ে দিলে। পেছন পেছন ভূঁইয়া জীপে নিজে একা।

রাত্রি পৌনে বারোটা।

শহরময় প্রলয় সংগীত।

টেলিফোন ডেড, মৃত।

ভূইয়া তার সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিল, "আগুনের শিখা ধরে গাড়ী চালিয়ে যাও।" সেই ভাবে তারা রাস্তা একের পর এক পার হচ্ছিল। সবই জনমানবহীন। কাজেই স্পীডে কোন ব্যাঘাত ঘটছিল না।

পলাশী ব্যারাকের কাছে তাদের গাড়ী এসে পড়েছে। মুসলিম হলের দিকে মুখ। সাঁজোয়া গাড়ীর একটা ছোট্ট শেল এসে ফেটে পড়ল। সোজা হীট। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাশ ফায়ার।

দমকলের বিরাট গাড়ীটা ছিটকে পড়ে এক দিকে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। সমস্ত ফায়ারম্যান যে ক'জন ছিল সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল। কারো কারো লাশ গাড়ীর উপর, করো বাংলাদেশের মাটির আশ্রয়ে।

ট্ ট্ ট্ ... ...

রাইফেলের গুলীও চলছে।

সয়ীদ ভূঁইয়া বুঝতে পারেন না, হঠাৎ কী ঘটে গেল। একটা গুলী তার বুকে লেগেছে। জীপের ষ্টিয়ারিং তখনও এক হাতে। আর এক হাতে বুক চেপে ধরেছে ভুঁইয়া। একটা মিলিটারী গাড়ী শাঁ...শাঁ...ছুটে আসছে। আশ্বস্ত যেন ভুঁইয়া। চীৎকার নয়, চ্যালেঞ্জের ভংগী কন্ঠে সে ডাক দিলে, "ভাইয়ো অফিসার...অফিসার...।"

অবশিষ্ট জীপ কখন প্রথমে গেছে। ভূঁইয়া যেন বিশ্ববাসীকে আহবান করবে। তাই প্রাণপণ চীৎকার দিলে 'ভাইয়ো, অফিসার ... ...।

দুটো মিলিটারী জীপ তার পাশে এসে থামল। কয়েক জন নেমে পড়ল। ব্রিগেডিয়ার আসলাম নামে এক অফিসর ভূঁইয়ার জীপের সাথে এসে দাঁড়াতে জখমী কন্ঠে যতদূর গ্রাম বাড়ানো চলে, তেমনই পর্যায়ে ভূঁইয়া বললে, "ভাইলোগ, আপলোগ মেরা সব ফায়ারম্যান কো কিউ মরা ... হাম লোগ সব ডিউটি মে নিকলা ... শহর মে আগ (আগুন) লাগা ... হাম লোগ সব ফায়ার ব্রিগেড কা আদমী ... ... ।

"কিয়া ?" বিগ্রেডিয়ার আসলামের পাশে আর একজন দাঁড়িয়েছিল, সে জিজ্ঞেস করে বসল।

"কিয়া ?" এবার প্রশ্ন বিগ্রেডিয়ারের।

"হাম... । ভূঁইয়া চট করে জবাব দিতে পারে না।

"কিয়া ?" এবার প্রশ্ন। ব্রিগ্রেডিয়ারের জিজ্ঞাসা।

"হামলোগ ডিউটী করনে নিকলা।" সয়ীদ ভূঁইয়া জবাব দিলে।

"ডিউটী করনে আয়া ?"

"হাঁ।'

'ডিউটী—?' আসলামের সঙ্গী অফিসার হেসে উঠল।

"হাঁ।" ভূঁইয়ার জবাব।

এবার দুই অফিসার প্রায় এক সংগে খেঁকিয়ে উঠল, 'শোনো, বাঙ্গলীকে বাচচা, হাম ভী ডিউটী মে নিকলা। মেরা আব ডিউটী হ্যায় আগ (আগুন) লাগানা, জায়সা তোমরা হ্যা বুজানা (নেভানো) ... সমঝা ... ?"

সারা জীবনের শিক্ষা হয়ত সেদিন সয়ীদ ভূঁইয়ার সামনে বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের মত খাড়া হয়েছিল। জবাব দিতে গিয়ে তার ঠোঁট নড়েছিল মাত্র কয়েকবার। কারণ পরক্ষণে তার জখম বুক থেকে হাত খসে যায় এবং সে এক দিকে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সয়ীদ ভূঁইয়া জীপের উপর কী বলতে চেয়েছিল সেদিন ?

আমরা কেউ কোনদিন তার হদিস পাব না।

ক্ষমাবতী

মেয়েটা আর হাঁটতে পারছিল না।

অনেক আগেই বাপ তার ক্লান্তি লক্ষ্য করেছে। আগে তবু সে পায়ে পায়ে চলার তাল ঠিক রাখছিল। নিজে যেমন জোর দেয়, কন্যাও তেমন গতি দ্রুত করে। কিন্তু তার পক্ষেও সামাল দেওয়া অত সহজ নয়। পয়ষট্টি বছর বয়সে গায়ে আর কতো তাগত থাকে? যা ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। তবু যে সে মাটির উপর পা ফেলে ফেলে এগোতে পারছিল, তা কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

চিন্তার সময় আর কোন এক সময়ে পাওয়া যাবে। এখন শুধু পথের দূরত্ব শেষ করে আনাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ, আবার কখন শত্রু ধাওয়া করবে, কে জানে? এই শত্রু আশপাশের কোন ডাকাত নয়। ডাকাতেরও ভয় থাকে। এই দস্যুদের কোন ভয়-ডর নেই, দিনে-রাতে যখন খুশী আসতে এবং যা খুশী করতে পারে। কেউ বাধা দেবে না। কেউ এগিয়ে আসবে না এতটুকু সাহায্য করতে। এই শত্রু বাংলাদেশের কেউ নয়। তার জন্ম বাংলায় নয়। নিজের ভাষায় কাকুতি-মিনতি করবে বা দোহাই দেবে মনুষ্যত্বের—আল্লার—রসুলের? কোন যোগা-যোগ নেই এমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে। কোথায় কোন এলাকা আছে পশ্চিম পাকিস্তান—সেখান থেকেই নাকি এরা আগত।

তমিজ মিয়া তেইশ বছর ধরে সে কথা শুনে এসেছিল। আরো শুনে এসেছিল তারও আগে বড় বড় মিটিং মারফৎ: ওরা আমাদের ভাই, এক মজ্‌হাব (ধর্ম) এক কেতাব, একই রসুলের উম্মৎ—সব প্রাণে প্রাণ, এক কওম। একটা বিশ্বাসের শিকড় তমিজ মিয়ার বুকে জায়গা নিয়েছিল। নিরক্ষর মানুষ। তাই নিজে আর বেশী তলিয়ে দেখতে

রাজী ছিল না। লেখাপড়া জানা মানুষেরা যা ব'লে সে মেনে নিয়েছিল। তার বেশী কিছু দরকারও ত নেই। অত মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? মেহনৎ করে দিন গুজ্‌রান হলেই খোদার কাছে শোকর। দুনিয়ার কাছে দাবী-দাওয়াও বেশী নেই। দু'মুঠো ভাত বছরে দু'টো লুংগী একজোড়া গামছা। শীতের মৌসুমে কোন রকমে গা-ঢাকা একটা কিছু। চাদর না হয় মোটা একটা জামা। চাহিদা একদম আঙুলে গণা যায়। আর কি বা চাওয়া যায় আল্লার কাছ থেকে? সংসারে বউ থাকলে হয়ত চাহিদা বাড়ে। সেদিকে তমিজ মিয়ার খালি হাত-পা। দশ বছর আগে বউ মরে গিয়েছিল। মেয়েটার বয়স তখন মোটে পাঁচ। আর নিকার সাধ জাগেনি তার। আর মেয়েটা হয়েছে এমন যে, যেন দুনিয়ার সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে তার। ছোট মেয়েরা কতো বায়না ধরে বাপের কাছে। আজব মেয়ে তামিনা—তহ্‌মিনা—তার অমন জিদই নেই। আর কোন সন্তান হয়নি তমিজ মিয়ার। স্ত্রীকে বাঁজা ধরে নিয়েছিল। হঠাৎ আল্লার কী শান বুড়ো বয়সে উত্তর পঞ্চাশে এমন দৌলতে ঘর ভরে দিলে। কী খুশী হয়েছিল তমিনার মা। আল্লা সাধ পুরো করেছেন। একটা মেয়ে। জামাই আসবে ঘরে। কতো আহলাদ। কিন্তু। আল্লাহ্‌ হঠাৎ তাকে তুলে নিয়ে গেল। হ্যাঁ, হঠাৎ। বার দুই দাস্ত, কয়েকবার বমি। সব শেষ। পরে বাপ হোলো মা। প্রতিবেশীদের কিছু সাহায্য নিতে হোতো। তা-ও খুব অল্প। পাঁচ বছরের মেয়ে যেন মায়ের বয়স নিয়ে জন্মেছিল। একদম পঞ্চাশ বছরের গৃহিণীর মত বোধ। ধীরে ধীরে সব গুছিয়ে নিলে। ন'বছর বয়সে বাপের জন্যে রান্না পর্যন্ত পাকা গৃহিণীর মত সেরে রাখত। আর কী মেহনতী গতর। বিয়ে অনেকে আগেই দিতে পারত। অমন লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু তমিজ মিয়ার আশা এইখানে কিছুটা আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল। বিঘে তিনেক জমি আর হালের গরুর মালিক সে। অল্প-স্বল্প জমিয়ে কোন ঘর-জামাই আনতে পারলে সব দিক রক্ষা হয়। মেয়ে ঘরে রইল আর একজন জোট-বল মানুষও পাওয়া গেল। এইসব ভেবেচিন্তে একটু দেরী। নচেৎ বারো পার হতে দিত না সে। পনর এমন বেশী বয়স নয়। তাছাড়া, মেয়ে ছাড়া বেঁচে থাকার চিন্তাও কঠিন। বুড়ো কালে লাঠি লাগে দেহের ভার রাখার জন্যে, মনের ভাব রাখার

জন্যে লাগে মানুষ। তমিনা চলে গেলে দুনিয়া অন্ধকার। ঘরেই রাখতে হবে তা-কে। তার জন্যে কিছু টোপ দরকার। শুধু জমি দেখে কোন ছেলে কী বাপ-মার ভিটে ছেড়ে আসতে চাইবে? তমিনা গাঁয়ের রেওয়াজ অনুযায়ী ঈষৎ ডাগর। তা নিয়ে বাপের মনে সামান্য অস্বোয়াস্তি ছিল। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে তা চেপে যেত, যেমন চেপে যেত সে নিজের সঞ্চয় সম্পর্কে।

—বা-জান!

মেয়ের চোখের দিকে তাকায় তমিজ মিয়া। তার কাঁধ ধরেই ত মেয়েটা হেঁটে আসছে। সোজা চলতে পারে না সে। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। পা সহজে ফেলতে অক্ষম। পাঁচজন পাকিস্তানী সেনা তাকে পালাক্রমে বলৎকার করেছিল গ্রামে অপারেশনের সময়। আজন্ম মেহনতের সঙ্গে পরিচয় ব'লেই হয়ত প্রচুর রক্তপাতের পরও সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছল। অনেকক্ষণ. প্রায় আট ঘন্টা সংজ্ঞাহীন থাকার পর।

—না।

—বা-জান!

মেয়ে তখন চোখ বুঁজে নিয়েছে। তমিজ মিয়া থামতে গিয়েও ধীরে ধীরে পা এবং দীর্ঘশ্বাস এক সঙ্গে ফেলছিল।

নিশিগ্রস্ত যেন মেয়েটা।

পায়ের কামাই নেই। কিন্তু তমিজ মিয়ার চোখের উপর দিয়ে নানা ছবি দৌড়ে দৌড়ে একটার উপর আর একটা হুমড়ি খায় এবং মিলিয়ে যায়। আশ্রয় নিতে দিগ্বিদিক হন্যে,—যেন জন্তু—গ্রামের ঝোপঝাপ, পানা-বন, পাট ক্ষেত গাঁয়ের কতো পরিবার। অনেকে খেয়াল করতে পারেনি, কে কোন দিকে যাচ্ছে। তেমনই স্রোতে হঠাৎ তমিজ মিয়া উপলব্ধি করেছিল, তমিনা পাশে নেই। কিন্তু তখন চীৎকার দিয়ে ডাকা অর্থ আরো তার কাছাকাছি পাট ক্ষেতে আত্মগোপনকারী তিরিশ চল্লিশ জনের মৃত্যু অবধারিত করে তোলা। আর্তনাদ যখন গলার ওপারে থাকে, তখন বুক পাঁজরের কী দশা হয়, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বর্ণনা দিতে পারবে না। সাদা দাড়িসহ তমিজ মিয়া মুখ মাটিতে ঘষেছিল বার বার। যেন জননী বাংলাদেশের

বুকের কাছে তার সকল বক্ষভার নামিয়ে সে-ও মাটির সান্নিধ্য-সহযাত্রী হবে, পরে কেউ তা-তাকে দাফন দে'ক। সংজ্ঞা হারায়নি তমিজ মিয়া। এক সময় জল্লাদদের অন্তর্ধান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা গ্রামে আবার ঢুকেছিল, মৃতদের সৎকার করতে, আহতদের সাহায্য দিতে। শোকের কথা কেউ ভাবেনি। তার সময় কোথায়? চিরকালের স্নেহময়ী ক্রোড়-দাত্রী এই গ্রামে ত আর কেউ থাকবে না আপাতত। এক গেরস্থের ভিটার পাশে আম বাগানের নীচে পড়েছিল গাঁয়ের আরো কয়েকটি যুবতী মেয়ে। রক্তাপ্লুত দেহ, অধিকাংশ মৃত। তমিনা যেন পিতৃস্নেহের ডাকে সাড়া দিতে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারেনি। আশ্চর্য তেজ কোথা থেকে বুড়ো তমিজ মিয়ার দেহে সেদিন হঠাৎ জেগে উঠেছিল? হয়ত জানোয়ারের সামনে সচেতন মানুষ এমন শক্তি ফিরে পায়। মনুষ্যত্ব জাগলে দীপ্ত তেজ দূরে থাকে না। বাড়ীর দু'একটা জিনিস যেমন—কাঁথা, কাপড়ের গাঁঠরী আর মেয়েকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল সে। তারপর শত শত গ্রামবাসীর সঙ্গে অনিশ্চিন্ত গন্তব্যের পানে যাত্রা। মাঝে মাঝে মেয়ের নাকে হাত দিয়ে দেখেছিল, নিঃশ্বাস আছে কি না। সেই আশা বুকেই যেন পথের দিশা-সঙ্গী সে। রাত্রির অন্ধকারে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে তমিজ মিয়া আশ্রয় নিয়েছিল মেয়েটার জন্যে। সেদিকে তখনও পাক-বাহিনীর থাবা পড়েনি। সেই বাড়ীর মেয়েরা শুধু তমিনার শুশ্রূষা করেনি, কাপড় বদলে দিয়েছিল অফুরন্ত স্নেহ মমতা অঝোরে বইয়ে। গরম পানি, সেঁক, কিছু ঔষধের ব্যবস্থা—সব সেখানেই সম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আরো দু'দিন সেই গ্রাম থেকে গিয়েছিল তারা। পরদিন আশ্রয়দাতারাও আবার যাযাবর, পথের অতিথি। এই ভাবে না তখন কাফেলা শ' থেকে হাজার। হাজার থেকে লক্ষে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়েছিল। নানা পথের সঙ্গম-ধারায় শুধু জনতার স্রোত। সকলেই নিরাপত্তার তল্লাশী। কারো চেনাজানা আত্মীয় বাড়ী, কারো অন্য গ্রাম। কিন্তু লক্ষ লক্ষের মুখে একই লক্ষ্য-বার্তা: "বর্ডার পার হও, যতো পারো...জল্‌দি...সেখানেই প্রতিবেশী ভারতের বুক পাতা আছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী পূর্বেই জায়গা পেয়ে গেছে। ইজ্জৎ এবং সম্পদ লুটের আতঙ্ক থেকে অন্তত তারা নিরাপদ। অতএব, চল

...চলো...।" খেদানো জন্তুর মত আপন পদশব্দে ভীত মানুষের কাতার দ্যাখো—যারা একদা ইমারৎবাসী ভাগ্যবান না হোক খড়ো চালের নীচে নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজত। তারাই হাঁটছে নিজেদের তাগদের শেষে সীমায় পৌঁছে। তমিজ মিয়া হেঁটেছে, বিশ্রাম নিয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে। এইভাবে ত চৌদ্দ দিন কেটে গিয়েছিল। পথ আর ফুরায় না। কিন্তু জনস্রোত আছে, তাই নিজের অসহায়তা তার কাছে কাবু। আর অসুস্থ মেয়ে ত পাঁচ দিন তার কঁধে কাঁধে ছিল বললেই চলে। পরের সোমত্ত মেয়ে কোন জোয়ান বা মরদ কাঁধে নিতে চাইলেও আরজ করতে পারেনি কোন দিক।

—বা জান।

—কী বেডী?

দুই চোখ খোলা মেয়ের। কিন্তু বাপের দিকে সে চেয়ে নেই। দৃষ্টি এক জায়গায় মিললেও মনে হয় সেখানে কোন ভাষা নেই। উদাসীনতার কতো রকম না রূপ আছে।

মেয়ের আহ্বান তমিজ মিয়া শুনতে পায় আর কিছু না। কিন্তু তার জবাব যেন কোথায় থমকে থাকে আর এগিয়ে যায় না সাড়া জাগাতে—তা বুঝতে আর কতটুকু সময় দরকার? এখনও হুঁশ হারায়নি গ্রামবৃদ্ধ তমিজ মিয়া। এই বোধ এখনও অটুট, যত না লৌহ রোলার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাক।

দু'দিন আগে শুধু একটিবার পিতার কানে স্পষ্ট রণন তুলেছিল কন্যার আহবান: বা-জান, আমি আর বাঁচুম না।

—অমন কথা কইতে নাই, মা।

বাপের জবাবে সেই প্রত্যাশা ছিল, বোবা গিরি বুঝি ঝর্ণার বাক্য-গুঞ্জন হয়ে এবার ঝিরিঝিরি বইতে থাকবে, না-ই হোক প্রবল স্রোতাকার। কিন্তু মিথ্যে কুহক। যে-কন্যা ভাতের পাশে বসে পাখা দোলাত অথবা রাত্রে দাওয়ায় কতো কথা কইত সে গুটিয়ে গেছে নিজের মধ্যে এমন করে ভাবা কঠিন।

তবু আশা, মেয়েটা হাঁটিতে পারে। বেশী নয়, ষাট না সত্তর টাকা জমেছিল ক'বছরে, সে-সঞ্চয় ট্যাঁকে গুঁজে নিয়েছিল তমিজ মিয়া।

কিন্তু সব নোটগুলো তার কোমরে ছ্যাঁকা দিচ্ছিল সেদিন। ঘর-জামাইয়ের জন্যে তার কতো কৃচ্ছ্রতা গেছে। এই পরিণতির জন্যে? এমন প্রশ্ন সেদিন মনে উঠেছিল বৈকি। "আমি আর বাঁচুম না" শব্দে বুক দুমড়ে উঠলেও তমিজ মিয়া পরমহূর্তে বল ফিরে পেয়েছিল। বোবা হয়ে যায়নি মেয়েটা, আল্লার কাছে শোকর।

তমিজ মিয়া যেখানেই আশ্রয় পাক, মেয়েকে চোখে চোখে রেখেছে। এক গেরস্থ বাড়ীর অন্দরে জায়গায় পেলেও নিজে পাহারা দিয়েছে। নানা অলক্ষুণে কথা মনে আগা দেয়। বাঁচার আর কিছু থাকবে না তমিনা ছাড়া। প্রতিহিংসায় শক্ত হয়ে ওঠে তমিজ মিয়ার দুই চোয়াল এক-একবার। কিন্তু কোন কর্মপন্থা মনে জায়গা পায় না। এক ধরনের ধোঁয়ানো ভাব সব সময় তার বুকে আথালি-পাথালি করে।

সোজা রাস্তায় ত শত্রুর চোখে ফাঁকি দেওয়া চলে না। আঁকবাঁক নিতে হয়। এই ভাবে গন্তব্য পেছিয়ে যায়।

দু'দিন পরে এক গ্রামে তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পূর্বের চেয়ে মেয়ে অনেকটা সুস্থ। কয়েকটা টাকা বের করে রেখেছিল তমিজ মিয়া। গামছার খোঁটে বাঁধা। আসল সঞ্চয় যথারীতি গুপ্ত। মেয়েকে দুধের উপর রাখা। ভাত নিজের হাতে ধরে-বেঁধে শিশুর মত মুখে গুঁজে কোন রকমে এক মুঠো খাওয়ানো। পথে প্রায় দুধের অভাব হয়নি। তমিনার পা ফেলা দেখে বাপের আশ্বস্তির সীমা ছিল না।

এই প্রথম তমিজ মিয়ার বুক অনেকখানি হাল্কা বোধ হয়। গন্তব্য নিকটে। এই চিন্তা সমস্ত ক্লান্তি দূরে টেনে নিয়ে যায়। সেদিন আগের চেয়ে আরো দু'তিন লুক্‌মা ভাত বেশী খেয়েছিল তমিনা। পিতার বুকে তাই আরো জোর সঞ্চয় হয়। রাস্তা চলার ভীতি তাকে আর কাবু করতে পারবে না।

গেরস্থর ছোট দহলিজ। সেখানেই বাপ এবং মেয়ে কোন রকমে ছোট বেলা এবং রাত কাটিয়ে দেবে। গ্রামের লোক বর্ডার নিকটে ব'লে তখনও একদম পাত্তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়েনি। তবে বাড়ীর বেশীর ভাগ লোক আগরতলা চলে গেছে। দু'এক জন আছে বাড়ী পাহারা দিতে। হঠাৎ বিপদ এসে পড়লে লুকিয়ে পড়ার জায়গা ঠিক করে

রেখেছে। খুব ভোর-ভোর এখান থেকে রওয়ানা দিতে হবে কিছু আঁধার থাকতে। ওই সময় নাকি বর্ডার পার হওয়া নিরাপদ।

বাপ মেয়ের দিকে তাকায়। বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। আহা, ওই মুখ থেকে কী আর কোন কথা ঝরবে না?

গৃহস্বামী ভালমানুষ। বাপ আর মেয়ের সামান্য আহারের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে দিয়েছিল। তমিজ মিয়া খায় অতি সামান্য। তার সব কিছু থেকে যেন রুচি চলে গেছে। এম্নিতে খামখা কাউকে বিব্রত করা চিরদিন তার ধাতের বাইরে।

দশ বারো দিন পরে তমিনা বাপের মুখের দিকে যেন সত্যি তাকাচ্ছে। চোখে তেমন ঘোর নেই।

তমিজ মিয়ার সুঠাম স্বাস্থ্য ছিল যৌবনে। আজ সব ক্ষয়ে গেছে। তবু পুরাতন কাঠামো থেকে সাবেক তেজ বেরিয়ে আসে। দুহিতার দৃষ্টি যেন তা উস্কে দেয়। চাপা তুষের আগুন হঠাৎ কেউ খোঁচা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছে যেন।

—মা, কিছু কইবা?

মেয়ে মাথা নাড়ে। খুবই অর্থবোধক। অর্থাৎ, সে কিছু বলবে না। তমিজ মিয়ার বুক ভরে ওঠে। তমিনার জ্ঞান ফিরে আসছে। সে বুঝতে পারে। উৎসাহ সে আবার ডাক দেয়, "মা"।

অন্য দিক থেকে নিঃশব্দ সাড়া আসে। হোক নিঃশব্দ। আহ, আল্লা য্যান মুখ তুলে চান, নচেৎ বাঁচুম ক্যামনে?

কন্যার শরীরের উন্নতি দেখে পিতার কথা বলার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। নিজের মনেই সে বলে, "আল্লার কাম দ্যাহো। গরীব মানুষ আমরা। কারো কিছু ক্ষতি করি নাই, দু'মুঠা ভাত খাইয়া শোকর করছি। অহন সব কাইড়া নিলেন।"

মেয়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দ নিজের সব কথা উজাড় করে। চোখে কিন্তু আবার ঘোর। তবু তমিজ মিয়ার উৎসাহ নিবৃত্ত হয় না। অতীতে কত ছোটখাট কথা বেরিয়ে আসে। অন্যদিক নীরব। তবু পিতা বলে চলে। এক সময় অজানিতে মেয়ের ক্লান্তি মাথা নিজের বুকে টেনে নিয়ে সস্নেহে তার চুলে আঙুল বুলায় আর

বৃদ্ধের দুই চোখ দিয়ে দরদর পানি বয়ে পড়ে।

সামনে তিন চার বিঘা দূরে গোমতী নদী। এখান থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। হঠাৎ স্তব্ধ চেয়ে থাকে তমিজ মিয়া সেই দিকে।

মেয়েও বাপের বুকে উস্‌খুস করে। এক সময় সোজা দহলিজের মেটে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে সোজাসুজি। নদী তার-ও চোখে পড়ে বৈকি।

বাবা কাছ থেকে সরে না। নিজের মনে অনেক কথা বলে যায়। বার বার নসীবের কথাই ফিরে আসে। যেন অদৃষ্টের লেখার জন্যেই এত বিপত্তি তার জীবনে।

—বা-জান।

— কি রে বেডী?

তমিনা চুপ করে যায় আর শব্দ করে না। বাপ মেয়ের মাথার উপর হাত রেখে অতি মোলায়েম গলায় বলে, "কিছু কওয়ার চাস বেডী?"

মেয়ে মাথা নাড়ে। সেই উৎসাহে পিতা প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে এবং সান্ত্বনা দিতেই ধরা গলায় বলে, "মা রে, তুই ছাড়া আমার কেউ নাই।...মা রে কথা কস্ না ক্যান? হোন্। জানোয়ারে কিছু কইরলে হে মনে রাখতা নাই। কুকুর কামড় দিলে কী মানুষে মনে রাখে, না পা কাইট্যা ফেলে? মানুষে কিছু কইরলে অন্য কথা। জানোয়ারকে মানুষে মাফ কইর‍্যা দ্যায়। মাফ কইর‍্যা দে মা—জানোয়ারদের মাফ কইর‍্যা দে—কথা কস না ক্যান বেডী? আমার বুক ফাইড্যা যায় রে তমিনা...।

হঠাৎ স্বরও চড়ে যায় অজানিতে পিতা বুঝতে পারে না। মেয়ের দিকে তাকায় সে। পাথরের মূর্তি চেয়ে আছে। নিষ্প্রাণ মেটে দেওয়ালের সঙ্গে যেন একাত্ম।

মগ্‌রিবের সামান্য আগে তমিজ মিয়া মেয়ের পাশে কাঁথার উপর শুয়ে হঠাৎ খোঁয়ারির চোটে ঈষৎ টলে পড়েছিল। ঘুম উদ্দেশ্য নয়। বুড়া গতর একটু হালকা করে নেওয়া। আশেপাশে লোক থাকলে তাদের মেয়ের দিকে চোখ রাখতে বলে, তমিজ মিয়ার যদি ঘুমে ধরে।

সেদিন আর কেউ পাশে ছিল না। পথে নামলে আবার সঙ্গী পাওয়া যাবে। তমিনার জন্যেই প্রতিদিন বেশী দূরত্ব সে অতিক্রম করতে পারে না।

এই আধা-ঘুমে হঠাৎ ধাক্কা খেলে বাপ। পাশে মেয়ে নেই, করোট ফিরতে গিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল।

ধড়মড়িয়ে উঠে তমিজ মিয়া চারপাশে তাকায়। হঠাৎ চোখে পড়ল, প্রায় তিন বিঘে দূরে নদীর বাঁধ-অভিমুখী তমিনা দৌড়াচ্ছে।

গায়ে আর সাবেক তাগদ নেই, গলা নেই। হাঁক মেরেছিল বৈকি তমিজ মিয়া কন্যার নাম ধরে। তারপর নিজেই দৌড় দিয়েছিল পিছু পিছু।

সামনে গোমতী নদী। জোয়ার শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

নদীর পাড়ে এসে মেয়েকে আর কোথাও না দেখে চীৎকার দিতে থাকে তমিজ মিয়া, "তমিনা—তমিনা—।"

তারপর নিজে নদীর উচ্ছল পানির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ, হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড়ে আসে দহলিজে। আবার সেখান থেকে নদীর দিকে ধেয়ে যায়। এই পালাক্রম, যতক্ষণ না সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। মিলিটারীর ভয়ে জনবিরল হয়ে গিয়েছিল এলাকাগুলো। কারো চোখে পড়েনি কিছু। গৃহস্বামী—আশ্রয়দাতা—আশপাশের লোক সঠিক হদিস করে উঠতে পারে না কিছুই। তমিজ মিয়া ত আর তমিজ মিয়া নেই, জিজ্ঞাসাবাদে কিছু পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে উন্মাদ-উন্মাদিনীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তোমরা যদি কোনদিন আরিচা—নগরবাড়ী—কি ডেমরা—কি মুন্সীগঞ্জ—না—বাংলা-দেশের যে কোন নদীর ঘাটে যাও, হয়ত কোন এক জায়গায় বাউণ্ডুলে তমিজ মিয়ার দেখা পেয়ে যেতে পার। চুলে জট, নিরেট পাগল, সদা চুপচাপ, কাঁধে কাঁথা-জাতীয় বুচ্‌কী এবং বিড়বিড় আন্দোলিত ঠোঁটসহ হঠাৎ হাঁটু জলে সে নেমে যাবে, তারপর বজ্রনাদী চীৎকার দেবে, "তুই আমারে মাফ কইর‍্যা দে, মা—মা—। আমি আর মানুষ নাই, মাফ কইরা দে, মা—মা—মা।"

তুমি অবাক হয়ে যাবে, বুড়া গলায় এত জোর?

ভারতীয় গোয়েন্দা

ভূমিকা

ঘটনাটা ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় ১৯৬৫ সনে হিন্দুস্থান—পাকিস্তান যুদ্ধের সময়।

ঠিক আট বছর পূর্বে।

ধাতুদৌর্বল্য রোগের মত বাঙালীদের মধ্যে স্মৃতিদৌর্বল্যের প্রাদুর্ভাব। তাই আমার কাহিনীর পুনরাবতারণা। নচেৎ নতুন করে কিছুই বলার প্রয়োজন ছিল না।

প্রথমে যে থলির মুখ খুলে দিয়েছিল এবং যার ফলে বাতাস তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালীর কানে সেঁধোয় তার নাম সৈয়দ আলী মজুমদার, সামরিক পেশায় ক্যাপ্টেন এবং অবসরকালে আমার বন্ধু।

মজুমদারকে নতুন করে স্মরণ করতে হয়। কারণ সে না বললে আমি আর কোথা থেকে জানতাম ? আমি শোনার পরে আরো বন্ধুদের না বলে চুপ থাকতে পারিনি। তাদের মুখে মুখে গোটা বাংলাদেশ ঘোরা হয়ে যায়। এক কান থেকে দু'কান। তারপর তিন কান। তারপর গোটা শহর। তারপর? আর না বললেও চলে। বাঙালীর কথা একবার যদি এক পেট থেকে বেরোয়, তা অন্য কানে-পেটে না সেঁধিয়ে থাকতেই পারে না। আবার সেঁধিয়েও তিষ্ঠোতে অক্ষম। বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে আর এক জঠরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তা-ও কয়েক মিনিটের জন্যে। তাকেও বেরুতে হয়। এইভাবে শেষে দেখবে, উইপোকার মত গর্তে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। এই পিলপিলানি বাংলাদেশ দেখার মত। ধন্যবাদ, বাঙালী সন্তান মজুমদারকে। তার কাছে আমি ঋণী।

তার কাছে আরো ঋণ আছে গোটা দেশের। পঁচিশে মার্চের পর সে বিদ্রোহী সৈন্যদলে ছিল এবং এক সময় শহীদ হয়। মজুমদারের স্মৃতি তাই আমার কাছে বিষাদময় হোলেও আনন্দে অন্যদিকে ভরে যায়। সে-যে এই মাটির সন্তান সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

এখন ভাবি, কী যন্ত্রণাই না নিয়ে মজুমদার চাকরি করত! ১৯৬৫ সনের যুদ্ধের সময় তাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আমার বন্ধু, সৎ মানুষ। কিন্তু তার দেশপ্রেম কতো গভীর ছিল, তখন উপলব্ধি ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। এই জন্যে আমার পরিতাপের অন্ত নেই।

সবই অতীতের কথা। মাত্র আট বছরের ব্যবধানে কতো কী ঘটে গেল। মজুমদার সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়। তার জন্যে একটা বড় গ্রন্থ রচিত হতে পারে। এখানে তার সঙ্গে সম্পর্ক ১৯৬৫ সনের হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের যুদ্ধকালীন সময়টুকু নিয়ে এবং তারপর আরো তিন বছর। আমি মজুমদারের কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তা হুবহু বলতে পারব, এমন আশা করা অন্যায়। তাই ঠিক করলাম, তার মুখ-জবানী শোনাই ভাল। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার চেয়ে বেশী নিজের জিভই ঢের বেশী কার্যকর। এই প্রবাদ মনে রেখে আমার পরলোকগত শহীদ বন্ধু মজুমদারের বয়ান আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। নেপথ্যে এইটুকু বলে রাখতে পারি, মজুমদার ছিল কথক নাম্বার ওয়ান, ফার্স্ট ক্লাস। টেপরেকর্ডারের রেওয়াজ চালু ছিল। কিন্তু আমার ত ওই যন্ত্র নেই, থাকলে গোপনে টেপ করে রাখতাম। শোনার মত তার বাচন-ভঙ্গী। আর কণ্ঠস্বর যেন সুর-বাঁধা কোন যন্ত্র। কোথাও ঘা পড়লে বেসুরো কিছু বেরুতেই পারে না। আমার আজও অশেষ আফশোস, অন্ততঃ লং হ্যাণ্ডে লিখে রাখা উচিত ছিল। দেশবাসীর কাছে একটা ঐতিহাসিক অমূল্য দলিল থাকত। যাক, তা নিয়ে আর কোন অনুতাপ করে লাভ নেই। এখন মজুমদারের কথাই শোনা যাক, মজুমদারের মুখে। যদিও জানা কথা সেই শব্দ-রও আমি তুলে ধরতে অক্ষম।

অথ মজুমদার

শোনো জহির, যুদ্ধ লেগে গেল। আমাকে কিন্তু ময়দানে নামতে হয়নি। মনে রেখো, মিলিটারীদেরও প্রশাসন লাগে। আমি তখন হেড-

কোয়ার্টারে লিয়াজোঁ অফিসার। আমার বেশীর ভাগ কারবার পাবলিকের সঙ্গে। ওদিকে কোথায় কী হচ্ছে, তার খবর রাখা।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। সাপে-নেউলে যুদ্ধ জমে উঠতে দেরী হয়নি। দেশটা গরম হয়ে উঠল। কী বড় বড় বক্তৃতা, আর নেতাদের বিবৃতির ঠেলা। হামলাকারী হিন্দুস্থান। রখতে হবে, যুদ্ধ হচ্ছে পশ্চিমে। অথচ পূব খুবই গরম। আর খেমকারান কি অন্যান্য সেক্টরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট যত জান দিচ্ছিল, তাদের নিয়ে এখানে কতো গর্ব। দেশের জন্য জান দিচ্ছে, ময়মনসিংহের এক ক্যাপ্টেন মারা যায় ওয়াগা সেক্টরে। তার মা এখানে খবরের কাগজে বিবৃতি দিলে, ভদ্রমহিলার আরো তিন ছেলে আছে। সকলককে তিনি দেশের রাস্তায় কোরবানী দিতে প্রস্তুত। মা-শা-ল্লাহ! কী জোস। আর সবচেয়ে জোস দেখালে তোমাদের কবি-সহিত্যিকেরা। একজন বেতারে চীৎকার দিলে, 'আরাকান থেকে তুরখাম—বগুড়া থেকে বেলুচিস্তান—আমরা সব এক হ্যায়, ভাই হো, ভাই হো। ভদ্রলোক ভূগোল জানে কিনা সন্দেহ। মাঝখানে হিন্দুস্থান, অমন বিশাল হিন্দুস্থান পড়ে আছে। বগুড়া যেন বেলুচিস্তানের পাশাপাশি। যাক, আমি হেড কোয়ার্টারে বসে বসে মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখতাম। সামনে আবার পাঞ্জাবী অফিসার বসে আছে। আর আমিও তো চাকরি করে খাই। হঠাৎ হেসে খামখা খুঁচিয়ে ঘা করতে যাই কেন?

যাক সে-সব কথা। দেশের গরম-গরম আবহাওয়া। তোমরা ত এ সব জানো। পাকিস্তানের জন্যে সব জান-কোরবান মন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবিশ্যি এদিকে যুদ্ধের নাম নিশানা নেই। তবু জান্ দিবে।

একদিন কয়েকটা থানা থেকে খবর এলো, বেশ কিছু ভারতীয় গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। তাদের সংখ্যা কয়েকশ। ওদের ইণ্টরোগেট সারা দরকার। সব হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবে, না, সরেজমিন থানার হাজতেই কাজ সারা হবে।

পাঞ্জাবী অফিসার কায়ক শ' শুনে আমাকে ইংরেজীতে বললে, মজুমদার, তোমাদের পূর্ব-পাকিস্তানীদের মত সাচ্চা পাকিস্তানী আর হয় না। যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছিল, নানা ভারতীয় চর খবর নিতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে পারে। তাদের যেন জনসাধারণ নিকটস্থ থানার জিম্মায় পৌঁছে

দেয়। দেখছ, আমার পূর্ব-পাকিস্তানী ভায়েরা কী রকম সজাগ। আমি হাঁহুঁ দিয়ে সারলাম। পাঞ্জাবী অফিসার আরো যোগ করলেন, "দেখো ভাই শও শও স্পাই। বলো এৎনা ইঁহা লানে কা কিয়া জরুরৎ। উহি থোড়া ইণ্টরোগেট করতে। জো আসলি হোগা উসকা মের৷মত ইহা হো সাক্‌তা।

ঠিক আছে। যাওয়া যাক। খামখা দলে দলে ধরে এনে কী লাভ? যেগুলো তুখোড় ঘড়েল গোছের, সে গুলোকে নিয়ে এলেই চলবে, বাকী হাজতে থাক।

পাঞ্জাবী অফিসারটার নাম মজহার খান। আমরা শহরতলীর এক ফাঁড়িতে জীপ চালিয়ে এলাম। আমারও কৌতূহল কম নয়। ভারতীয় গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। এমন কাজে আর কখনও জড়াইনি। আমার অভিজ্ঞতা নেই। স্থতরাং কৌতূহল খুব স্বাভাবিক।

ফাঁড়ির ও-সি মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আমাদের খুব তাজিমের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে। অফিসে বসিয়ে মোলায়েম স্বরে শুধালে তখনই চায়ের বন্দোবস্ত করবে কি না। কিন্তু আমি বা মজহার খান কারো ভ্রুক্ষেপ ছিল না চায়ের দিকে। আমরা আসামী পেলেই খুশী।

ওসি বলল, প্রায় পঁচিশ জন গোয়েন্দা তার হেফাজতে রয়েছে। হাজতে জায়গা কম। তাই তাদের একটা বড় কামরায় আটকে রাখা হয়েছে। পঁচিশ জন! সংখ্যা কম নয়। এত লোক। ওদের এক এক করে এখানে আনার চেয়ে একদম সরেজমিনে যাওয়াই ভাল। মজহার খান এই যুক্তি দিলে।

ওসি আর দেরী করলে না। থানার কমপাউণ্ডের পূর্বদিকে একটা বিল্ডিং, বেশ পুরোনো। আমাদের সেখানে নিয়ে গেল।

হঠাৎ কানে অনেক কোলাহল, চীৎকার ধাক্কা মারলে। কান খাড়া করলাম। কী যেন গোলমাল। আমি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেলাম। ওসি আমাদের অকুস্থলে নিয়ে যাচ্ছে।

বন্দুকধারী দু'জন কনেষ্টবল আমাদের ফটকে স্যালুট দিলে বুট ঠুকে। ভেতরে একটা বারান্দা পার হয়ে একটা হল কামরার কাছাকাছি আসতে

জন্ম যদি—৫

জোর চীৎকার শোনা গেল। সেদিকে আর আমার কৌতূহল নেই। নিকটস্থ কোন কামরা থেকে আসছে। এখনই বোঝা যাবে, জিজ্ঞেস করে কী লাভ?

একটা কামরার সামনে দুই বন্দুকধারী সান্ত্রী আমাদের আবার স্যালুট দিলে। তারা বিরাট এক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মোটা মোটা তালা ঝুলছে দরজায়।

ওসি বললে, "খুলে দাও, আর আমাদের সঙ্গে একজন এসো।'

বিরাট কামরা। তারি মধ্যে গোয়েন্দাদের আটক রাখা হয়েছে। প্রাচীন আমলের বাড়ী। অনেক উপরে জানালা। কিছু ইতিহাস আছে পেছনে। পরে ওসি'র কাছ থেকে যোগাড় করতে হবে। এখন আসল মামলা তদারক করে দেখা যাক।

গোটা পঁচিশেক গোয়েন্দা। একজন চীৎকার করে উঠল, আগে যে চীৎকার শুনেছিলাম। একটা ছোকরার গলা থেকে বেরুচ্ছে। বয়স পঁচিশের বেশী নয়। কিন্তু পরনে একটা ছেঁড়া লুংগি। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। সে বসে মুখ হাতে ঢেকে রেখেছে। চীৎকার দেওয়ার সময় হাত সরাচ্ছে।

বাকী চব্বিশ জন কী? সবই একরকম। ষাট পর্যন্ত কারো কারো বয়স। বিশ-বাইশ থেকে শুরু। দেখেই মনে হবে, ভিক্ষুক উন্মাদ বা ঐ জাতীয় আর কিছু।

আমার বলতে হোলো না, মজহার খানই ওসিকে জিজ্ঞেস করলে, "ইস্‌মে কুই পাগল নেই হ্যায় ত?"

"নেই হুজুর" ওসি জবাব দিলে।

তারপরই মজহার খান আরো যোগ করলে, "ইয়ে ইণ্ডিয়ান লোগ বহু চালাকি সে কাম লেতা। দেখ, কেৎনা স্পাই ভেজা?"

জিজ্ঞেসপড়া কে করবে? দেখে মনে হচ্ছে, সবই বাঙালী। আমি দোভাষীর কাজ করব। মজহার খান আমার সিনিয়র অফিসার। ওই আরম্ভ করতে পারে।

করলেও তা-ই।

একটা গোয়েন্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। বয়স তিরিশ। কৃচ্ছ্রতার চিহ্ন গোটা শরীরে। চোখের দৃষ্টির মধ্যে অসহায়তার ছাপ। কিন্তু চোখে চোখ পড়লে মনে হবে, লোকটা অপরের উপর রেগে ঘুষি মারছে তোমার মুখে।

—এই তোমহারা কিয়া নাম ? মজহার খান শুধায়। লোকটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠতেই সান্ত্রীরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে। কিন্তু মাটিতে আবার পা পড়তেই লোকটা গান ধরলে:

নাম কী অত সহজ জানা
নামের ভেতর নাম আছে
যেমন চামের মধ্যেই হাম থাকে
নাম-নাম-নাম যে তার নানা
না-না-না না-না - - - - - ।

আমার আগেই মজহার খান হেসে উঠেছিল। তাই আমিও হেসে উঠলাম। লোকটা মুখচোখ কুঁচকে এমন অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল, মনে হবে, বদ্ধ উন্মাদ।

ওসিকে খান জিজ্ঞেস করলে, "একে কেন ধরে আনা হয়েছে ?"

জবাব দিলে দারোগা, "লোকটা গ্রামে হাটের মধ্যে প্রেসিডেণ্টকে গাল দিচ্ছিল।" কী গাল ? তারও জবাব দিলে ওসি। "আইয়ুব খান মাদার্চোদ, ভূট্টো বেটিচোদ—আরো নানা রকম খিস্তি।"

"ধোলাই দেকর সিধা করো ইসকো।" খান নির্দেশ দিলে এবং বললে, ইয়ে শালা কট্টর হিন্দুস্তানী হোগা। "ইয়ে ঈস্ট পাকিস্তানী হ্যায় কি নেহি, খবর লিয়া ?"

"হা, হুজুর। ইয়ে তিন-চার দেহাৎ গ্রাম কা নাম বোলা। খবর লিয়া ইস্‌কা ঘর উহা নেহি।" ওসি জবাব দিলে।

"ইয়ে শালা আসলী হিন্দুস্তানী ?" লোকটা তখন হেসে উঠল হি-হি শব্দে এবং গান ধরলে :

আসল নকল কী সহজে বুঝা যায়
মায়ের গর্ভ থেকে এলি
বল দেখি সে সতী না অসতী ?
ঘুরতে হয় কত যে ধাঁধাঁয়।
আসল নকল কী - - - -

আমাকে আবার দোভাষীর কাজ করতে হলো। শুনে খান বললে, "ইয়ে শালা এডুকেটেড (শিক্ষিত) হ্যায়। ইসি সে পাত্তা চলতা, ইয়ে শালা স্পাই হ্যায়। ইণ্ডিয়ান লোগ্ খালি চালাকিসে কাম লেতা।"

লোকটা তখন চীৎকার করতে লাগল, "দারোগা বাবা,—রাত্রে—একটা মেয়েমানুষ ব্যবস্থা করে দিতে পারো ?

আমার বেজায় হাসি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলাম। দোভাষার কাজ করতে হোলো। শুনে খান বললে, "ইয়ে পাগলপনা সব ঝুট। ইসকো হেডকোয়াটার মে ভেজো। হাম ইসকো পাত্তা লুংগা।"

ওসি জবাব দিলে, "আচ্ছা হুজুর।" হঠাৎ দেখা গেল, কামরার এক অন্ধকার কোণে রীতিমত ফাইট শুরু হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার মধ্যে। ঘুষাঘুষি, কিলাকিলি। একজন নীরব কর্মী, অপরজন সরব। ঘুষি চালাচ্ছে আর চীৎকার দিচ্ছে, "তুই শালা পাকিস্তান তো আমি হিন্দুস্তান। দেখি শালা তোর গায়ে কতো তাগদ ? আয় শালা—আয়—।"

কাজে রীতিমত বাধা পড়ল।

একটা সান্ত্রী দু'টোকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে আলগ করলে।

প্রাচীনকালের ঘর। ভোটকা গন্ধ। তার উপর বর্তমান অধিবাসী-দের গায়ের গন্ধ মিশে একদম ভিজে কাঠে মড়া পোড়ানের সময় যে আবহাওয়া হয়, ঠিক সেই দশা। চাকরীর নওকর। আমার আর এক মিনিট দাঁড়ানোর মেজাজ ছিল না। কিন্তু মজহার খান খুব উৎসাহী। সে আরো কয়েকটা আসামীর ঠিকানা দিলে।

শোনো, জহির। সেদিন আরো কয়েকটা ফাঁড়ি দেখলাম। মোদ্দা কথা, যত পাগল ছিল পথে-ঘাটে সবগুলো এনে হাজতে ঢুকিয়েছে। পাঞ্জাবীদের উৎসাহ অনির্বাণ, যদি হিন্দুস্তানী কিছু পায়। আমি দোভাষী মাত্র। আমার অত উৎসাহ ছিল না।

তবে একটা ঘটনা তোমাকে না বলে পারছি নে। বাবুপুর না সূত্রাপুর থানায় সেই গোয়েন্দা আটক ছিল। জওয়ান লোকটা ধবধবে ফর্সা চেহারা। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। দেখে মনে হয়, কোন সাধারণ পরিবারের লোক নয়। কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ। মজহার খান তাকে নিয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত, আসল ভারতীয় স্পাই। তাই তাকে ইণ্টারোগেট করতে হেডকোয়ার্টারে এনেছিল। আমাকে রাখতেই হয়। কারণ দোভাষী দরকার। ফাঁড়ির মধ্যে লোকটার পরণের এক লুংগি ছাড়া আর কিছু ছিল না। হেডকোয়ার্টারে বসন তেমনই রইল।

পাঞ্জাবী দুই অফিসার আর আমি এক কামরায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লোকটাকে হাজির করা হোলো। আসামী তখন অতি শান্ত। প্রথমে খান শুরু করলে, ''তোমরা নাম ?''

'মহবুব আলী।'

'এজুকেটেড ?

'ইয়েস।'

''কুই ডিগ্রি হ্যায় ?''

''বি. এ. অনার্স ইন ফিলজফী। আমি ত জবাব শুনে থ। সেদিন তাহলে পাগলামির ভান করে ছিল। আসল গোয়েন্দা রূপ এতদিনে ফুটে বেরুচ্ছে। জবাব দিচ্ছে অতি শান্ত মানুষের মত। মজহার খানের উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। লোকটার দূরদৃষ্টি আছে। এবার বোধ হয় সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, এমন কী মাহবুব আলী তার বাড়ীর ঠিকানা পর্যন্ত বললে।

জিজ্ঞাসাবাদ এগোচ্ছে। এক জায়গায় এসে থামল। মজহার খান বললে, ''তোম ইণ্ডিয়ান হ্যায় ?''

''নেই। মেরা বাপ থা।''

''তোম কোন ?''

''বাংগালী।

খান তার সঙ্গী অফিসারকে বললে ''দেখো, ইয়ে বাংগালী শালা কিয়া বোলতা ? ইসকো মুহ মে পাকিস্তান নেহী আতা।''

ব্যাস, শুরু হয়ে গেল ডুয়েল। মহবুব আলী চীৎকার দিয়ে উঠল, "শালা গালি কিউ দিয়া ?"

—চুপ খামুশ।

মহবুব আলি পালটা ধমক দিলে, "চুপ খামুশ শালা পাঞ্জাবী।"

তারপর দুই দিকে খিস্তির বন্যা। দুই অফিসার গোয়েন্দাকে এলোপাতাড়ি বুটশুদ্ধ লাথি এবং কিল ঘুষি একত্রে চালাতে লাগল। আসামীর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। শরীরের বহু জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। শরীরের বহু জায়গায় জখম। শেষে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। দু'জন জোয়ান অফিসারের চোটপাট কতক্ষণ আর বেচারা সহ্য করতে পারে ?

সেই সময় কিছু ঝুঁকি থাকলেও আমি বলতে বাধ্য হলাম, "ইয়ে পাগল হ্যায় ছোড় দিজিয়ে।"

দুই অফিসার আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকালে না। বলা বাহুল্য।

কিন্তু পরে রিপোর্ট পাওয়া গেল, সত্যি মহবুব আলী পাগল। ফিলজফির অনার্স গ্র্যাজুয়েট। ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। গত ১৯৬৪, ফেব্রুয়ারী মাসের দাংগার পর পাগল হয়ে গেছে। গত দেড় বছর বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ। এতদিনে বাড়ীর লোক খবর পেয়ে তাকে নিতে এসেছে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। খামখা সন্দেহের বশে নিরপরাধ লোকটা অত মার খেলে, মরেও যেতে পারত।

সতর দিনের কুরুক্ষেত্র শেষ। জানো জহির, তিন বছর পুরো হয়নি। ১৯৬৮-র জুন কি জুলাই মাস। আমি আমার ড্রয়িং রুমে বসে আছি, হঠাৎ কলিং বেল বাজল। উঠে গেলাম। দরজা খুলে দেখি, এক গৌরতনু ভদ্রলোক, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাহেব, স্যুটে-বুটে—এমন কী টাইয়েও নিখুঁত।

—সালাম আলেকুম।

—সালামালেকুম।

—আপনি মিঃ মজুমদার ?

—জী।

—দেখা করতে এসেছি।

—আসুন।

ড্রয়িং রুমে অতিথিকে নিয়ে এলাম। একটা কোচে বসে সে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন ?

'না।'

'আমি মহবুব আলী কুমি-টোলায়'। এইটুকু বলতে আমি মুখ খুললাম, 'আর বলতে হবে না। কেমন আছেন, ভাই ?'

মহবুব: ভাল।

আমি: দাঁড়ান, চায়ের কথা বলি।

মাহবুব। না—তার দরকার হবে না। আপনার কাছে এসেচি—।

আমি: কী বলুন ?

মাহবুব: আই আম ইন ট্রাবল। আমি ট্রাবলে পড়েছি।

আমি: কী বলুন।

মাহবুব: সেই পাঞ্জাবী অফিসার দুটো কোথায় ?

আমি: বদলী হয়ে গেছে ?

এঁ্যা—। অদ্ভুত এক চীৎকার দিয়ে মহবুব কোচ থেকে উঠে দাঁড়ায়ে পড়ল।

আমি হতভব। তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার ?

—তাদের আমার দরকার।

—তারা এখানে নেই।

মহবুব আলীর গলার স্বর ক্রমশ চড়ে, "তাদের আমার দরকার। একটা ব্যবস্থা করুন, আপনার পায়ে পড়ি।"

সত্যি মহবুব আলী আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার দুই হাত ধরে থামাই। কিন্তু মহবুব আলী নিরস্ত হলেও দাঁড়িয়ে চীৎকার দিয়ে উঠল, এখানে নেই--তাদের লাথি কিল ঘুষিতে আমার মাথা ঠিক হয়েছিল। আবার মাথার ট্রাবল দেখা দিয়েছে। তাদের আমার দরকার, মিঃ মজুমদার—

আমার কথা বলার সুযোগ হয় না, সে চীৎকার দিতে থাকে : "আমার মাথায় গোলমাল পাঞ্জাবা লাথি ছাড়া কী করে সারবে ? ও আল্লা—"

মহবুব আলী চীৎকার দিতে দিতে তার টাই কোট খুলতে লাগল। শার্ট হেচকা টানে চড় চড় ছিঁড়ে গেল।

আমি বাধা দিব কী ? হতভম্ব, একদম হতভম্ব।

শেষে পাৎলুন খুলে শুধু আণ্ডার ওয়ার পরে মহবুব আলী আবার ড্রইং রুম থেকে রাস্তার দিকে দৌড়ে গেল।

চেঁচামেঁচি শুনে ...আমার চাকরটা ও ছুটে এসেছিল, তাকে বললাম, দ্যাখ ত ফর্সা জাঙিয়া পরা লোকটা কোথা গেল, ধরে আনবি।

পাঁচ মিনিট পর বয় ফিরে এলো। কোন দিকে গেছে লোকটা কোন হদিস দিতে পারলে না।

জননী ঃ জন্মভূমি

তিন বৃদ্ধাই একমত ঃ

তারা কেউ গ্রাম ছেড়ে যাবেন না।

এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। সত্তরের কাছাকাছি বয়সে নিজের প্রাণ নিয়ে হিসেব নিকেশের এমন কি থাকে ? সব প্রশ্ন ত সেখানেই ঘুরপাক খায়। বাকী থাকে ইজ্জৎ। বয়স সেখানেই প্রচুর নিরাপত্তা দিতে পারে। যুবতীর কাছে যা আশঙ্কাজনক বৃদ্ধার মনের কাছ দিয়েও তা ঘেষঁতে পারে না।

সমস্ত গ্রাম প্রায় শূন্য। তারা তিনজন শুধু থেকে গিয়েছিল একই ভিটা আঁকড়ে। অমন বয়সে ছুটাছুটি বা ত্রস্ত এদিক-ওদিক আশ্রয়ের জন্যে হন্যে হওয়া শারীরিক কারণে আদৌ সম্ভব নয়। একজন হয়ত তেমন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পেত। কিন্তু সমবয়সী আরো দু'জন সঙ্গে— এই ভরসা সকলকেই সাহস যুগিয়েছিল।

উনিশ শ' একাত্তর সালে এমন সমস্যা বহু জায়গায় দেখা দিয়েছিল বৈকি। বিশেষত যে সব এলাকা মিলিটারী অপারেশনের সহজ আওতায় পড়ে, সেখানে নিরাপত্তার ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্নই তুলত না। সোজা যে যে দিকে পারে একটু স্বস্তি পাওয়ার জন্যে সব ছেড়ে যাযাবর হয়ে বসত। দাবানলের পর ঠিক যেন জন্তুদের দুর্দশা।

পাশাপাশি ভিটা। কিন্তু তিন বৃদ্ধা এক ঠাঁয় এসে জুটেছিলেন একজনের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য সহজ ঃ কথাবার্তায়, পারস্পরিক সান্নিধ্যে দুঃখ-ভয় অনিশ্চয়তার বোঝা হাল্কা করা। বন্যার দিনেই সব পিঁপড়ে এক পিণ্ডে পরিণত হয়।

তিন জনের মধ্যে কসিমন বিবি বোধ হয় বয়সে দু'এক বছরের বড়। হয়ত সত্তর অথবা তার কিছু উপর যেতে পারেন। অলিমন বিবি আটষট্টি হবেন। আর খাতু বিবি মনে হয় তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। তা-ও সাতষট্টি বছরের কম নয়। বয়সের এই ফারাক এখানে অবান্তর। তিন জনেই বৃদ্ধা। চুল পাকা শন। শরীরে জরার ধাক্কা বেশ প্রকট। কসিমন বিবিকে একটু শক্ত দেখায়। মনের দিকেও তার তেজ বেশী। নিকটে কোন গুলি-গোলার আওয়াজ হলে আর দুই সঙ্গীর বুক যখন থরথরিয়ে উঠত, তিনি অভয় দিতেন, 'আল্লা ছাড়া আর কাউরে ডরের কী আছে? আরো বৈশিষ্ট্যময় কসিমন বিবির মুখাবয়ব। গালে রেখার উঁকি যথেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য দুই চোখ। স্নেহমূর্তি কোন উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী যেন প্রশ্ন করে কারো মুখের দিকে চেয়ে আছে— ঠোঁটে মৃদু হাসির রেশ। তার সেই প্রশ্ন যেন সদ্য এই মুহূর্তের বা আজকের নয়। বরং অনেক কালের। ওই চোখে চোখ পড়লে সহজে ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন।

দিন শুরু হয়।

দিন শেষ হয়।

তিন বৃদ্ধা অনেক সময় ত্রিকোণ মুখোমুখি শুধু চুপচাপ বসে থাকে। কারো কথা বলার ইচ্ছা নেই, তা নয়। বুকের ভেতর সব জমাট হয়ে আছে। এই বরফ শুধু সহজে দ্রবীভূত হয় না।

কসিমন বিবি বিরাট সংসারের গৃহিণী। পাঁচ ছেলে, ছেলেদের বউ, নাতিপোতী, নাৎনা, গরুবাছুর, হাঁসমুর্গী, উঠানের আশেপাশে গাছপালা, মাচান, ফসল ফলানো নানা আয়োজন। বিরাট গেরস্থ চাষী পরিবারে কাজের কী কামাই আছে? কতো রকমের খবরদারী। পোষ্যদের বায়না, রোগের সেবা, মগরবের ওয়াক্তে কুঁচো ছেলেদের চিল্লাচিল্লি কান্না—এমন শত ঝক্কি। তা পোয়ানো নানা শব্দ নানা কথার হাট—নানা ব্যাপারের শেষ এবং শুরু। এই প্রবাহ সহজে থামে কী? ঘুমের মধ্যে তাহলে কেউ স্বপ্ন দেখত না।

এখন কেবল নিঃশব্দে জাবর কাটা। তিন জনেই অভ্যস্ত। অথচ বেরিয়ে আসার চেষ্টা কম নয়। ছেলেবেলা থেকে খাটুনীর অভ্যেস ছিল।

তাই নিজেদের আহারের সরঞ্জাম করে নিতে তেমন তকলীফ ছিল না। সেখানে চাহিদা অতি সামান্য। কিছু ডালে চালে সিদ্ধ করে নেওয়া। আলু ভাতে। আহার নামে মাত্র ছিল। হঠাৎ শূন্যতার মধ্যে বাঁচার জন্যে আগ্রহ থাকেনা। অলিমন বিবি নিজের ফাঁদ যেন নিজে পেতেছিলেন। কয়েক বছর আগে তাদের এই গ্রাম থেকে উঠে যাওয়ার কথা। পৈতৃক সম্পত্তি দেখার লোক নেই। বাপ তা-ই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিধবা কন্যা স্বামীর গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবে না। এমন বেঁকে বসলেন। ফলে, একমাত্র কন্যার পিতা নিজের গ্রামের সম্পত্তি বেচে বুড়াকালে মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়ার আশায় এখানে উঠেছিলেন। বেচারা বেশী দিন ভোগ করতে পারে নি। তিন বছর পূর্বে মারা যায়। অলিমন বিবির বাপের গাঁ নদী নালা ভরা এক দূরগম্য জায়গা। মিলিটারীরা কোন কালেই সেদিকে পা দেবে না। আজ বড় খাতিরজমায় আছে ওই এলাকার লোক। বড় আফসোস হয় অলিমন বিবির। ছেলেপুলেরা কে কোথায় গেছে সঠিক জানা যায় না। কারণ এক গাঁয়ে গিয়ে হয়ত তারা উঠল দু'দিন বাদই আবার তল্পী গুটাও—মিলিটারী আসছে। অবিশ্যি তিন বৃদ্ধার খবরদারীর অভাব হত না। মাস খানেক সামান্য অসুবিধা গিয়েছিল। তেল বা লবণের অভাব। তারপর এই গাঁয়ে মানুষ ঠিকই আসত এবং তারা খবর দিয়ে যেত—যদ্দূর কুশলাদি সংগ্রহ করতে পারে। যারা আসত, তারা রাতের মুসাফির। হাতে বন্দুক, বুক-পকেটে উঁচু উঁচু বোমা বা আর কিছু। পরনে সাদামাটা ধূসর লুংগী সব তাজা-তাজা তরুণ ছেলের দল। কখনও আট দশ জনের দল এসে পৌঁছত। প্রথম রাত্রে তিন বৃদ্ধা কম ভয় পায়নি। কী যে কারণে একবার পিদিম জালতে হয়েছিল তাদের কিছু-ক্ষণের জন্যে এই আলোই হ'ল বিপদ। হঠাৎ তাদের টিনের দরজায় মৃদু ধাক্কার আওয়াজ। তিন বৃদ্ধা হাউমাউ করে উঠত। কিন্তু কসিমন বিবির উপস্থিত বুদ্ধি জোর। তিনি অন্ধকারে দুই সঙ্গীর ঠোঁটে নিজের হাতের তালু-যোগে ইশারা করেছিলেন যার অর্থ: 'খামখা হাউ মাউ করস না।' কি কর্তব্য তখন, তারা—ভাবছিলেন! আবার কী পিদিম জালবে?

কিন্তু অনুচচ গলার আওয়াজ তখনই তারা শুনতে পেয়েছিলেন, 'মা, আপনেরা ডরান না। আপনেরা তিন জন আছেন, আমরা জানি। খর ঠাহর করতে পারছিলাম না। পিদিম জালাইয়া বড় উব্‌কার করছেন।''

পিদিম জ্বলেছিল আবার।

দরজা খুলে হকচকিয়ে গিয়েছিল তিন জনে। হাতে হাতিয়ার সব পোলাবান। তারাই অভয় দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর যথা মৃদু, "মা, আপনেরা ডরান না। মাঝে মাঝে আমরা আমু, তহন থাইকতে দেন যেন। আর কেউ আইলে কাউরে কিছু কইয়েন না।"

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ কী শিক্ষা শুরু হোলো, মাবুদ? তিন বৃদ্ধাই সেদিন এমন প্রশ্ন তুলেছিলেন বৈকি নিজেদের কাছে। আশ্চর্য উত্তেজনার সেই প্রবাহ। দুমাসের সব ক্লান্তি যেন উবে গিয়েছিল। পরিজন-হারা তিন জনে আর এক পরিবারের জননী হয়ে বসবে কোন দিন ভাবতে পারেনি। জীবনের সকল অর্থ যেন তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। তাই চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন অবাস্তব। শুধু কাজে নিমগ্ন থাকাই চরম আনন্দ।

তিন বৃদ্ধার ঠোঁটে হাসি ফুটেছিল। অবসর যাপন আর বোঝা নয়।

"বুবু রে বুবু, পেরথম দিন আমিত ঘাবড়াইয়া কান্দনের উপক্করম। বুঝি হেরাও মিলিটারী। মুখ দিয়া বারাইয়া পড়ল 'তোমরা কেডা?'

খাতু-বৌর কথা লুফে নিয়েছিলেন অলিমন বিবি, 'বাংলাদেশের ফওজ।'

হ বুবু তা শুইন্যা আমার বুক ভইরা উঠল। ভয়-ডর তখনই শ্যাষ। কা জোয়ান জোয়ান পোলা দেইখলে জান ঠাণ্ডা হইয়া যায়। খাতু-বৌ এই কাহিনী একদিন বলে—ক্ষ্যান্ত হয়নে। অবসর জমানোর যেন আর অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপাদান তার কাছে বহুদিন ছিল না।

সেই সব রাতের অতিথিরা আসে আবার অন্ধকারে চলে যায়। চেনা-অচেনা নানা মুখের ভিড় জমে ওঠে। কখনও রান্নার প্রয়োজন হয় গভীর রাত্রে। তিন বৃদ্ধার এতটুকু কুণ্ঠা বা গড়িমসি দেখা যেত না। সংসারে এই এক নতুন খেলা। তারা তিনজনে যেন নবীন কিশোরী। পরিত্যক্ত অতীত হুড়মুড় উপস্থিত হোতে পারে এবং এমন আকস্মিক ভাবে—তাদের জানা ছিল না। সকলেই ভাবত, দিন কেন তাড়াতাড়ি শেষ হয় না? যেন নবীন বধূ-জীবন ফিরে এসেছে এক আশ্চর্য পথ ধরে।

—কসিমন বুবু!

—কও।

—লড়াই কবে শেষ হৈব?

—খোদা জানে। ক্যান জিগাও?

—এইসব পোলাবানগো দেইখ্যা বড় মায়া লাগে।

—খাতু-বোন, করার কিছু নাই। তাই আমি আর এসব ভাবি না। মার ইজ্জত পোলাবানেরাই রাখে।

পেরথম দিন যেদিন ওদের দেইখলাম আর চা খাওয়াইলাম—খাতু-বৌর কাছে ওই কথা ফিরে ফিরে আসে, যে-কথা দিয়েই আরম্ভ হোক না। কসিমন বিবির চোখ আবার ভবিষ্যতের দিকে। এই টানাপোড়েনে আশ্চর্য এক জমিন নকশা গড়ে উঠেছিল তখনকার দৈনন্দিনতার মধ্যে।

এইভাবে হয়ত অনেক দিন চলতে পারতো। দিনের দুর্বিষহতা তিনজনে পার হয়ে এসেছিল। কিন্তু একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসে এই এলাকায় একটা ঘটনা সব ওলটপালট করে দিল। রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত গ্রাম আছে মিলিটারীরা জানে। কোন কোন জায়গায় তারা আগুন লাগিয়ে দিত, অনেক সময় স্রেফ খেয়ালবশত। কিন্তু এবার তারা ভয়ানক সন্দিগ্ধ এবং সক্রিয় হয়ে উঠল। কারণ এই, গ্রামের দু'মাইল দূরে একটা মাইন বিস্ফোরণে জীপ উল্টে আট-দশ জন খান-সেনা মারা যায়। তার মধ্যে দুজন অফিসার।

পাল্টা হামলা শুরু করলে ফৌজী দঙ্গল। সামনা সামনি কোন শত্রু নেই। তাই আরো হন্যে হয়ে উঠল তারা। পরিত্যক্ত গ্রাম তবু তল্লাশী শুরু করলে। প্রতিহিংসা নিবারণে যেখানে কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে গ্রামের কুকুরগুলোর উপর চোট নিলে বেদেরেগ গুলি ছুঁড়ে। আশপাশের ঝোপে আগুন লাগিয়ে দিলে।

এই তাণ্ডবের মুখেই পরবর্তী ঘটনার সূত্রপাত।

একদল সৈন্য তাদের অনুচর রাজাকার ও একজন বাঙালী সিপাই সহ মজকুর গ্রাম ঘিরে ফেললে। তারপর শুরু হোলো তল্লাশী। প্রায় দেড়শ জনের কাফেলা। ছোট গ্রাম এবং প্রায় পরিত্যক্ত গ্রামের হিসেব-নিকেশ নিতে কতক্ষণ আর লাগে। বেশীর ভাগ চাষীদের খড়ো বাড়ী, দু-চারটে টিনের ঘর, দালানের সংখ্যা তিনের বেশী নয়। আর এত তল্লাশী

নয়, স্রেফ ভাঙ্গো মিসমার কারো। পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়িগুলো পর্যন্ত রেহাই পেলে না। টিনের ঘর মুখ থুবড়ে পড়ল। পরে যার খুশী এসব টেনে নিয়ে যাক। অবিশ্যি সেদিন মিলিটারীরা, জানি না, কী যেন ভেবে কোথাও আগুন লাগায়নি।

পালার শেষ প্রান্ত।

তিন বৃদ্ধা টের পেয়েছিলেন বৈকি। এত গুলির আওয়াজ, হৈ-চৈ তাদের কানে যাবে না কেন? কেউই কালা নন। এক শ্রেণীর মিলিটারীদের সঙ্গে বৃদ্ধাদেরও পরিচয় আছে। কিন্তু তারা ভুলেও দিরে আসবে না এখানে। সুতরাং বাকী রইল বাস্তব হদিস সহজেই বুঝে গেলেন। তবে সেদিন কারো বুকে এতটুকু ভয় ছিল না। আসুক! কী দেখবে তারা?

কিছু রাজাকার এবং মিলিটারী কসিমন বিবির উঠানে এসে পেঁৗছল। দুজন রাজাকার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল বেশ চীৎকার সহ, দরজা খুলুন। খানা তল্লাশী হবে।

ভীত নয়, তবে কিছুটা আতঙ্কিত। তিন বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিল দরজার ওপারে।

কসিমন বিবি দরজা খুলে দিলে। পেছনে আর দুই সঙ্গিনী।

সকলের চোখে পড়ল সেই চোখ। এক আতঙ্কিত কিশোরী বৃদ্ধার খোলস পরে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

"বেরিয়ে আসুন, আমরা ঘরের ভেতরটা দেখব" বললে এক বাঙালী সিপাই।

তিনজনে সুড়সুড় এসে উঠানে দাঁড়ায়। ভিড়ভিড় করে এক-গাদা রাজাকার এবং খান-সেনা ঘরে ঢুকল। দলের ক্যাপ্টেন বাইরে এদিক ওদিক তাকায়।

কী আছে ঘরে যে দেখার জন্যে বহুৎ সময় খর্চা হবে।

তিন বৃদ্ধা আদৌ ঘোমটা টানেনি। সব পোলাবানের বয়স। এদের লজ্জা কী। তিন জনে একে অপরের গা ঘেঁষে' দাঁড়িয়ে যেন তিনজনে একাঙ্গ লেপটে যেতে পারলে খুশী হতো।

ক্যাপ্টেন তাজ খাঁ চেয়ে চেয়ে তিন বৃদ্ধার দিকে চোখ ফেলছিল। কি মনে করে সে একটা সিগারেট ধরালে।

দংগল বেরিয়ে এল। রায় দিলে, আপত্তিকর কিছু নেই।

ক্যাপ্টন তখন বললে, আরে সব চিড়িয়া ভাগা। ইয়ে তিন স্রেফ রহ গিয়া?

—জী, হঁ্যা। এক রাজাকারের জবাব।

—শালা আস্‌লী চিজ সব কাঁহা?

—সব ভাগা। নেপথ্যে আবার জবাব।

—লেকিন শালা... ... বিরক্তির স্বরে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাজ খাঁ আবার উচ্চারণ করলে, 'শালা হাম লেকিন ছোড়নেওয়ালা বান্দা নেহি। এই—।'

তারপর সে খান-সেনাদের হুকুম দিলে, "এই দেখো, ওই দো বুডটি কো ইন্‌টরোগেট করো বাহার লে যাও। হাম ইয়ে বুডটি (কসিমন বিবির দিকে তর্জনী) কো ইনটরোগেট করুংগা।

এইবার তিন বৃদ্ধার মধ্যে সত্যি আলোড়ন ওঠে—যা আদিম ভয়েরই পুনরাবৃত্তি। দুই জনকে একদিকে সরিয়ে নেওয়ার সময় কসিমন বিবি আর্তনাদ করে উঠলেন যেন তার দুই প্রত্যঙ্গ কেউ খসিয়ে নিলে।

ক্যাপ্টেন বাঙালী সহকর্মীকে বললে, 'তোম বাহার গার্ড (রক্ষী) রহো। হাম ইসকো আন্দার ইনটরোগেট করুংগা।'

দুই সঙ্গিনী চোখের আড়াল হয়ে গেল। কসিমন বিবিকে তাজ খাঁ হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। স্তব্ধ বৃদ্ধা যাদুকরের মন্ত্র-চালিত যেন কোন পুতুল।

ঘরের ভেতর আর্তনাদ উঠেছিল বৈকি। অসহায়ের এই আর্তনাদ নতুন নয় পৃথিবীতে।

ক্যাপ্টেন পনর বিশ মিনিট পরে পাৎলুনের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এসেই বাঙালী সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললে, "আরে তোম খাড়া হ্যায়? আরে তোম ভী থোড়া মজা কার লো। Any port in the storm—এনি পোর্ট ইন দি স্টর্ম।"

বাঙালী সৈন্য কাচুমাচু জবাব দেয়, ''নেহি, মজাক্ ছোড়িয়ে।''

''মজাক নেহি। যাও, আন্দার যাও, হাম গার্ড রহেগা।''

''নেহি, ক্যাপ্টেন সাহাব।''

তাজ খাঁর হঠাৎ যেন জিদ চড়ে গেল। আবার সে বললে, 'জলদি কারো—।'

বাঙালী সৈন্য শেষ মোক্ষম অস্ত্র ভেবে তা মুখ থেকে নিক্ষেপ করলে ''ও মা- কা উমর (মার বয়সী) হ্যায়।''

'আরে ছোড়ো বাৎ। দেশ কো ভী তোমলোগ মা বোলতা (অর্থাৎ দেশকেও ত তোমরা মা বলো।) ওসব বাৎ-কা-বাৎ।''

নেহি সাহাব মাফ কিজিয়ে।

এসব নখরা ছোড়ো।

হাম যব মজা করতা থা কিয়া তোমরা মজা করনে কা খাহেস নেহি হুয়া ?'' অর্থাৎ আমি যখন মজা করছিলাম, তখন তোমার কী মজা করার খায়েশ হয়নি ?

'মাফ কিজিয়ে, ক্যাপ্টেন সাহেব।''

''আভভি যাও—।'' এবার ক্যাপ্টেন বজ্রস্বরে উচচারণ করলে তার বাঙালী সহকর্মী উপরওয়ালার উদ্যত স্টেনগান এবং চোখ মুখের রঙ দেখে বুঝতে পারে আর দেরী করলে সমূহ বিপদ।

''চলো, চলো।'' পুনরায় ক্যাপ্টেনের অঙ্গুলি নির্দেশ পশ্চাতে উৎসাহ বা আদেশ।

পরবর্তী প্রেমিক দ্রুত এগোতে লাগল কসিমন বিবির ঘরের দিকে।

ওয়াগন ব্রেকার

স্বাধীনতার দামামার শব্দে উত্তরঙ্গ গোটা বাংলাদেশ।

বাড়ীর উঠানে ঢুকতেই মা হঠাৎ ঘোমটা টেনে বসল। ঝোপ দাড়ী-ওয়ালা কোন বেগানা মরদ অন্দরে ঢুকে পড়েছে। তৌবা!

লাতু তখনই হো হো শব্দে হেসে উঠল এবং দৌড়ে গিয়ে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, সাথে সাথে উচ্চারণ "মা আমারে চিনতা পারলে না? আমি লাতু—।"

হাউমাউ কান্নাসহ সন্তানকে বুকে চেপে জননী কী যে বলতে লাগল, বুঝা গেল না। এই নাটকীয় মঞ্চে তখন আরো দর্শক জুটে গেছে। লাতুর ছোট ছোট দুই বোন, বারো বছরের এক ভাই। তারা হকচকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মার কান্না, এক অপরিচিত মিলিটারী যদিও মুক্তিযোদ্ধা, অমন কোলাকুলি। সবই অভাবনীয়। তখনই বাপ জবেদ মিয়া কোথা থেকে যে নাজেল হোলো, আল্লা মালুম।

নাটক আরো জমে উঠল।

মা-কে আলিঙ্গন করার জন্যে লাতু তার ব্রেন্‌গান আগেই মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। সেদিকেও অনেকের নজর যায়। বিস্ময় ত শুধু এক কিসিমের নয়।

লাতু - - - লাতু - - -।

বাপ পুরুষ মানুষ বলে বোধ হয় অন্য আর কোন শব্দ উচ্চারণে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু তার চোখের পানি, আলিঙ্গনের দৃঢ়তায় সব অভাব মিটে যায়।

লাতুকে চেনার আরো অসুবিধা ছিল। সব সময় তাকে লুঙ্গি পরাই দেখেছে পাড়ার সকলে। তার বেশী কৃষক পল্লীতে লেবাস আর কি কল্পনা করা যায়? সেই ছেলের পরনে মোটা খাকী প্যাণ্ট গায়ে চার পকেটওয়ালা বুশ শার্ট। চেহারাই কি খোলতাই হয়েছে। মা-শা-আল্লাহ। এম্নিতে ছেলেবেলা মোটা-তাজা জন্মেছিল, সেই রকম লম্বা, ছ'ফুট তিন ইঞ্চির কম হবে না। এখন ঝোপ-দাড়ীর ফলে মুরুব্বী দেখায়। তবে বেমানান কিছু না।

বাপ শোকর গোজার করে আল্লার দরগায়। কত কেঁদেছে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে রাতের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। কতো মৃত্যুর খবর আসত প্রতিদিন। তার লাল ..ক ক আর বেঁচে আছে? তা হলে দুমাস কোন খবর দেয়নি।

আল্লার কাছে হাজার শোকর।

পাড়া কি, গোটা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। লাতু ফিরে এসেছে লড়াই করে। গাঁয়ের কৌতূহল গর্ব সব একাকার মিশে যায়। প্রতিবেশীসুলভ ছোট-খাটো কলহ-জাত ঈর্ষা, মনকষাকষি সব কোথায় যেন তলিয়ে গিয়েছিল।

বহুজনকে আলিঙ্গন অথবা কদমবুসি (প্রণাম) এই হুল্লোড়ের মধ্যেই চলে। ক্লান্ত লাতু কিন্তু ক্লান্ত হয় না। শেষে বিচক্ষণ বর্ষীয়ানই তাড়া দিয়েছিল "চলো এ্যাহন। গাঁয়ের পোলা হগ্‌গল কথাই শোনা যাইবো পরে। ওরে জিরাইতা দাও।"

এইভাবেই সেদিন পয়লা আসর খালি হয়েছিল। মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে লাতু বহুদিন পরে ঘরের আস্বাদ ফিরে পায়। আশ্চর্য তার কাঁধে ব্যাগ ঝুলছিল, সেটা নামিয়ে রাখার কথা কেউ বলেনি। প্রাথমিক উত্তেজনার রীতি, বোধ হয় এই রকম।

পরম উত্তেজনা আরো গোপন ছিল, লাতু যখন কাপড়-চোপড় খুলে লুঙ্গি পরতে-পরতে মার হাতে দু'শ টাকা দিলে।

—কতো ট্যাহা বাজান?

—দুইশ, হৈব।

—দুইশ, ।

গরীব চাষী পরিবারে একজোট দুশ' টাকা। অভাবনীয় নয়, অবিশ্বাস্য।

—কুথা পাইলি, বাজান?

—কতোজনে দিছে। শহরৎ যহনই গেছি, মুক্তিযোদ্ধা জানলে মানুষে দিতে বখিলী করে নাই।

—বা-জান, বা-জান!

লাতুর মা তার বেশী আর কিছু উচ্চারণ করতে পারেনি সেদিন।

আরো কিছু টাকা অন্য এক পকেটে থেকে গিয়েছিল। দুশ'খানেক হবে। পরদিন নিকটের বাজার থেকে লাতু ছোট ভাই-বোনদের জন্যে জামা, বাপের জন্যে লুঙ্গি, মার জন্যে শাড়ী কিনে আনলে, তখন যেন কোন ঈদ-জাতীয় পর্ব ফিরে এলো। আর লাতু ত প্রতি বাড়ীর মেহমান। সকলেই যুদ্ধের কাহিনী শুনতে লাগল। অনেক রাত হলে তবে সে ফুরসৎ পায়।

দুটো মাত্র বাঁশের খড়ো চালা-ঘর। মা পুরাতন কাঁথা বিছিয়ে দেয়। ছেলের জন্যে মাদুরের উপর। লাতু হেসেছিল তখন। "মা, শক্ত জমিনের উপর শুইছি। ঝোপঝাড়, বন-বাদাড়ে রাত জাইগ্যা বইস্যা কাটানো। আপনে এসব কি করেন? দ্যাশ স্বাধীন হৈছে, আরো মেহনৎ করা লাইগব। দ্যাশ গড়তা হৈব না? অত আরাম চাইলে খষলৎ খারাপ হৈয়া যাইব।" ছেলের মন্তব্যে অবিশ্যি মা কান দেয়নি। বরং কিছুটা ছেলের জন্যে বাকীটা নিজের জন্যে মন্তব্য করেছিল "বা-জান কতো তকলীফ করছো, অহন কিছু আরাম দরকার। মানুষের শরীর ত আর পাথরের নয়।"

চাষী পরিবারের স্নেহ-মায়া-মমতা-উচ্ছলতায় হুল্লোড় কয়েকটা দিন।

ঠিক সাতদিনের মাথায় লাতু জানিয়ে দিলে তাকে শহরে ফিরতে হবে। ছুটি শেষ। সেখানে গেলে, নির্দেশ-মত কাজ।

জিদ বিফল এমন ক্ষেত্রে। বাপ-মা দুঃখিত হয়। বিদায়ের দিন মা ত পারে না, বাবা অনেক দূর এগিয়ে দিলে ছেলেকে। দু'মাইল হেঁটে বাস ধরতে হবে। বাপকে অতদূর হাঁটতে দিতে লাতু রাজী নয়।

এক সময় ছাড়াছাড়ি হয়।

তার পূর্বে বাপ জবেদ মিয়া ছেলের মাথায় চুমু খেয়ে বললেন, "সহি সালামতে থাইক্যো। নেক রাস্তায় চইলো। আল্লা খুশী হবেন। রুজি-রোজগারে বরকৎ দিবে।"

একা একা হাঁটা পথে পেছনের টান থাকে বৈকি। বাপের নসীহৎ, শব্দগুলো হঠাৎ কানে ধাক্কায়। নেক রাস্তা …… (সৎ পথ) …… ।

নিজের মনে হেসে উঠেছিল লাতু। সঙ্গে বহু রাত্রির অন্ধকার তার চোখের সামনে দিয়ে নানা শব্দসহ বিদ্যুতের ঝিলিক-মারা আভাষ তুলে ছুটে যেতে থাকে … ……

একটা ট্রেন এলো, মালগাড়ী। শান্টিংয়ে পড়ে থাকবে তিন-দিন। এখানে কিছু মাল নামবে। … এই শালা, রেঞ্চ আনছিস … … মাল বাবুরে ভয় নাই … …রেল পুলিসের হাতে কিছু পেসাব করা লাইগব … … এই শালা জলদি কর, এটা রন্ডীবাড়ী না জুৎসই টাইম লইয়া মজ্জা করবা … …ল'শালা বস্তা মাথায় কর… এই বুদ্ধু, এই পেটীখানা জলদি ভাঙ্গ… চুপ শব্দ করিস না… টর্চলাইট-মারছে পুলিস… চাটগাঁ মেল আসার আগেই দে হাওয়া… হুশহুশ… আইয়া পড়ল…পুলিশ…

লাতু আনমনা নিজের হাতে ব্রেনগানের ট্রিগার চেপে ধরেছিল। তারপর লজ্জিত হয় বেশ। কিছু চোখের ঝাপসা ছবি সহজে মুছতে চায় না।

নিজের মনে মনে হাসে লাতু। অস্পষ্ট উচ্চারণ করেই বসে, "কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল?"

বিশাল মাঠের আলপথ। দূরে ভেড়ি বাঁধ। গন্তব্যস্থল এখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু লাতুর দুই চক্ষু তখন অন্য দৃশ্যের চলমানতায় বুঁদ…

আগরতলা মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নিজের নাম ধাম লেখানোর জন্যে সে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের সামনে।

প্রশ্ন। নাম ?
জবাব। লুৎফর ?
প্রশ্ন। পেশা ?
জবাব। ওয়াগন ব্রেকার।
প্রশ্ন। সত্যি ?
জবাব। ঝুট বলছি না।
প্রশ্ন। এখন কি করবেন ?
জবাব। দেশ স্বাধীন করতে লড়ব ... ...

সোজা আলপথ। নচেৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পারত লাতু। কারণ, চোখের সামনের দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই দেখছে না সে।

গুঞ্জন উঠেছিল তা-কে নিয়ে গোটা ক্যাম্পে। কিন্তু লাতু প্রমাণ দিয়েছিল, লড়াই কা'কে বলে। তার দুঃসাহসের কাহিনী শুধু এক সেক্টরে নয় বিভিন্ন ফ্রণ্টে চালু ছিল। আশ্চর্য একবারও সে জখম হয়নি। স্রেফ নসীবের জোর ছাড়া সেখানে আর কোন ব্যাখ্যার মওকা নেই।

বাসের হর্ণ লাতুর খোয়ারি চুরমার করে দিলে। মনের বর্তমান বেষ্টনী কাটিয়ে উঠতে একটা সিগারেট ধরালে সে এবং জোর টানতে লাগল। অবিশ্যি পা যথারীতি চালু।

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে।

॥ ২ ॥

বিরাট গেট। অবিশ্যি খোলা ছিল। সঙ্কোচ নিয়েই লাতু পার হয়। তারপর ছোট লন। শীতের মৌসুমী ফুল ফুটেছে কেয়ারী জুড়ে। লাতুর এসব দিকে চোখ যায় না। মাথার ভেতর তখন অন্য চিন্তা।

বেয়ারা এসে ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে দিয়েছিল। একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল লাতু। মনে মনে প্রশ্ন: এই তার গিয়াস ভাইদের বাড়ী ?

বিলোনিয়া এলাকায় তারা এক সঙ্গে লড়েছে। শুধু লড়া ? একসঙ্গে খাওয়া। আর খাওয়া মানে ডাল-রুটী। কোনদিন তা-ও ঠিকমত জোটেনি। আর লড়ায়ের সময় পাশাপাশি। কতদিন শুয়ে

থেকেছে না একই সঙ্গে, ঢালাও বিছানার উপর। চোখের সামনে হানা দিলে, এক ছিপছিপে ফর্সা তরুণের চেহারা। কিন্তু কি তেজ ওই শরীরে? আর তেমন দরাজ কণ্ঠ : জননী বাংলাদেশ, তোমার পায়ে সব কোরবানী করলাম। তোমাকে স্বাধীন করার পর, তবে আমার ছুটি। তার আগে না ···। গোটা দলকে সে উদ্বুদ্ধ করে রাখত। য়ুনিভার্সিটি-পড়া ছেলে। চমৎকার বক্তৃতা দিত, তেমনই চালাত রাইফেল। ··· ···

লাতুর পায়ের তলায় নরম কার্পেট হঠাৎ ছ্যাঁকা দেয় যেন। এই তার গিয়াস ভায়ের বাড়ী? ছ' সাত মাস দেখা নেই। চিনতে পারবে তো?

আরে লাতু ভাই! হঠাৎ ডাকে লাতু চমকে ওঠে। সে প্রায় বুঝে উঠতে পারে না, কখন আর এক জনের বুকে সে বাঁধা পড়ে গেছে, যার পরণে পরিষ্কার পাজামা, গায়ে ড্রেসিং গাউন।

এখানেও উত্তেজনা। গিয়াস বছর কুড়ি বয়সের তরুণ। খইয়ের মত ফুটতে থাকে।

—এতদিন কোথায় ছিলেন?

—গ্রামের বাড়ীতে।

—কতো দিন আপনার কথা ভেবেছি। আমি আবার য়ুনিভার্সিটিতে ফিরে গেছি। কয়েক মাস পরে পরীক্ষা। আপনি কি করছেন?

—কিছু না।

—কিছু না মানে?

—লেখাপড়া ত শিখিনি। থ্রি-ফোর পর্যন্ত পড়া—

—তবে? কিছু না করলে সংসার চলবে কেন? মা-বাপ আছে বলেছিলেন—।

—ওসব কথা থাক এখন, গিয়াস ভাই।

আবেদ, সলিম ওরা সব কোথায়? উত্তরদাতা হঠাৎ জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। তার চোখ-মুখ বেশ কঠিন হয়ে ওঠে এবং বেশ ঝাঁঝসহ উচ্চারণ করে, "ওদের কথা আর বলবেন না। সব 'ব্যাণ্ডিট' ডাকাত হয়ে গেছে।

—ডাকাত ?

—হ্যাঁ, লুটপাট, রাহাজানি, গাড়ী হাইজ্যাক করে।

—না-না। আপনি এসব কি বলছেন ? সলিম ভাই ত জান্ দেওয়ার জন্যে তৈরী থাকত। মনে আছে সেবার কসবা গ্রামের কাছে 'এ্যামবুশ' করতে গিয়ে—

—মনে আছে।

—তবে ?

—সব গোলমাল হয়ে গেছে। টাকার লোভ এমন পেয়ে বসেছে সবাইকে, কাজেই—

—কাজেই কি ?

—সব ওলটপালট। খান্‌কীর পুতেরা, টাকা ছাড়া দুনিয়ায় ভাল আর কিছু আছে বোঝে না। ফলে—

—আমার বিশ্বাস হয় না আবেদ ভাই ডাকাত।

—বিশ্বাস করুন, লাতু ভাই। (হঠাৎ) কথায় কথায় আপনাকে চা খাওয়ানোর কথা ভুলেই গেছি। দাঁড়ান, আসি।

উত্তরদাতা উঠে গেলে, লাতু বিস্ময়ে হাবুডুবু খায়। তার চেনাশোনা এক লড়ায়ের কোন সাথী হঠাৎ সমাজবিরোধী কিছু হয়ে গেছে তার বিশ্বাস হয় না সহজে।

—হ্যাঁ, তারপর বলুন, এখন আপনি কি করবেন ?

ফিরে এসেছিল গিয়াস। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন।

লাতু চট করে জবাব দিতে পারে না। চা আসতে কাপে চুমুক দেওয়ার লহমায় নিজের বিগত আট মাস চকিতে তার মনের উপর ঝিলিক দিয়ে যায়। বাপ-মা, ভাই-বোন আধপেটা খেয়েই দিন গুজরান করে। শহরে এসেছিল বাধ্য হয়ে। একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তিকে ধরে সুতোর 'পারমিট' পেয়েছিল। ছোট পারমিট। হাজার খানেক টাকা পেয়েছিল সে। অভাবের সংসারে ওই সামান্য টাকায় ক'দিন চলে ? চার পাঁচ মাসে শেষ হয়ে গেলে আবার শহরে। গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ

বেকার জীবন তার মত প্রাণবন্ত তরুণের জন্যে অসহ্য। শহরে এসেছিল লাতু। কিন্তু পাত্তা পায়নি কোথাও। সেই হোমরা-চোমরা ব্যক্তি যে একবার পারমিট পেতে সাহায্য করেছিল, তাকে পাওয়াই মুশকিল। কোন্ রকমে সাক্ষাতের ফল, শূন্য। আপিসে গিয়ে ত সে হকচকিয়ে যায়। একবার 'পারমিট' পাওয়ার অভিজ্ঞতা তার আছে। এই টেবিল—ওই টেবিল—এই কামরা, ওই কামরা। এই সাব—হেই সাব—।

—লাতু ভাই!

ডাকে সাড়া দিতে (জমিনের উপর নিজে) টেবিলের উপর চায়ের কাপ নামিয়ে জবাব দিলে, "কি বলুন?"

—কিছু মনে করবেন না, আমি যদি আপনার খেদমতে আসতে পারি, খুব সুখী হোব।

—খেদমত?

—খেদমত?

হঠাৎ শব্দটা লাতুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

—না, অর্থাৎ—

--লজ্জা পাবেন না। এক সঙ্গে লড়ে দেশ স্বাধীন করেছি। আপনার সে-সব দিনের কথা আমি ভুলতে পারব না। কিছু দরকার থাকলে—

—না, এম্নি দেখা করতে এসেছিলাম। আপনার ঠিকানা আমার মনে ছিল।

—মনে রেখেছেন তা হলে?

—তা আর মনে রাখব না।

কেন জানি, মনের কথাই লাতু চেপে গিয়েছিল। কোথাও তার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। মা-বাপ, ভাই-বোনেরা আছে, তাই সমস্যা। সে শুনেছিল, গিয়াস মল্লিকের পিতা একজন বড় অফিসার। তিনি ইচ্ছা করলে—। এক কালের অহরহ-সংগীর কাছে কিন্তু অনুরোধ করা—আর অমন অনুরোধ লাতুর কাছে মনে হয়েছিল ভয়ানক অশালীন, মানুষের পৌরুষের বিরোধী। আরো অনেক কথা হয়েছিল বৈকি।

শেল-মর্টার রাইফেলে -আমার সোনার বাংলা-বন্দিত-শন্দিত অতীতের অস্ফুট আর্তনাদ। আসল কথা বাদ পড়ে গিয়েছিল।

ওঠার আগে গিয়াস জিজ্ঞেস করেছিল, "লাতু ভাই, এখন কোথায় যাবেন?"

—আমি?

—হ্যাঁ।

—আবার গ্রামে ফিরে যাবো।

॥ ৩ ॥

লাতু ঝুট কথা বলেছিল।

সে আর গ্রামে ফিরে যায়নি। বরং গ্রাম থেকে এসেছিলেন তার বৃদ্ধ বা-জান জাবেদ আলি মিয়া।

পুত্রের খোঁজ পেয়েছিলেন বৈকি তিনি। শহরের এই প্রান্তে গোরস্থানে এক সকাল বেলায় তিনি সন্তানের কবর তল্লাস করছিলেন। সঙ্গে এক কৃশদেহ গৌর তরুণ। পূর্ব-পরিচিত গিয়াস মল্লিক। বৃদ্ধের সংগী সে। তার হাতে একটা ভাঁজকরা পুরাতন খবরের কাগজ।

সারি সারি অনেক কবর। কতগুলো সদ্য তাজা। মাটি এখনও ভেজা।

চোখের পানি মুছতে মুছতে বৃদ্ধ জবেদ আলি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কোন কবর বাবা।"

"আরো একটু সামনে যান।"

"তোমার কতো কাহিনী আমার লাতু বলত। তাই খোঁজ করে তোমার কাছে এসেছি, বাবা, তোমাকে কষ্ট দিতে।"

"কষ্ট কি চাচা," শান্ত বিষণ্ন গলায় জবাব দিয়েছিল গিয়াস মল্লিক।

নির্জন কবরস্থান। সকালবেলা। তারা দুই জনে হাঁটছিল।

বৃদ্ধ হঠাৎ থেমে বলেন, "তুমি ঠিক জানো, বাবা?"

"চাচা, সকালবেলা খবরের কাগজ দেখে আমার সন্দেহ হোলো। পুলিশের যা খবর—দিনের দুপুরে মিলের বেতন আনছিল গাড়ী করে—তার

উপর অমন জায়গায় হামলা কম দুঃসাহস নয়। তিনজনই পুলিশের গুলিতে নিহত। তাদের একজনের দেহের বর্ণনা পড়েই আমি ভেবেছিলাম, হয়ত লাতু ভাই। অমন বুকের পাটা আর কার হবে। মাইন পোতার সময় বা কাণ্ড-কারখানা করত—মরণ নিয়ে যেন তার খেলা করা অভ্যাস। পুলিশের রিপোর্টে কপালে কাটা দাগের কথা ছিল। তখন মানুষ চিনতে আর আমার দেরী হয়নি। আমি ত আপনাদের গাঁয়ের ঠিকানা জানিনে। নচেৎ আমিই খবর দিতে যেতাম। খবরের কাগজটা আমার—'' গিয়াস হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।

''কেন এমন হলো, বাবা ?'' বৃদ্ধ প্রায় ডুকরে ওঠেন।

''চাচা, বেওয়ারিশ লাশের কবর এখানে। আপনি আর কাঁদেন না। যুদ্ধের কাজ ত ফুরিয়ে গেছে তাই এখন আমরা বেওয়ারিশ। আহা! লাতু ভাইয়ের মত ... '' গিয়াসের কণ্ঠ বুঁজে আসে।

''কোন কবরটা, বাবা ?''

গিয়াসের দ্বিধা কেটে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে বুকের জোর সঞ্চয় করেছিল।

'আপনার সামনে, বাঁ দিকের ওই কবরটা চাচা।''

মিথ্যে কথা বলেছিল গিয়াস মল্লিক, লাতুর কবর সে কোনদিন দেখেনি।

কিন্তু তাছাড়া সান্ত্বনার নোঙর ফেলার আর ডাঙা কোথায় ?

———